বঙ্গ কমলবার্তা

সংখ্যা-নভেম্বর। সাল-২০২৬



দেশের গণতন্ত্র বাঁচাতে চাই
কংগ্রেস-আরশোলামুক্ত ভারত



শঙ্কর হৃদয় মাঝে, কালী বিরাজে





আত্মনির্ভর বিকশিত ভারতের লক্ষ্যে কাশী-তে মহিলা পরিচালিত আধুনিক পোশাক তৈরির কারখানার উদ্বোধনে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী এবং উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী যোগী আদিত্যনাথ।





বাণিজ্য, প্রতিরক্ষা, প্রযুক্তি, মহাকাশ সহযোগিতা, এবং শক্তি ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার করতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আমন্ত্রণে ভারত সফরে পোল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ডোনাল্ড টাস্ক।





নয়াদিল্লিতে বিজয়াদশমীর অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী।

বঙ্গ
কমলবার্তা
নভেম্বর সংখ্যা। ২০২৬



স্বয়ংসেবক থেকে প্রধানমন্ত্রী
দেশসেবা-সংগঠন ও সংকল্পের এক অসাধারণ যাত্রা ৪
সুনীল বনসল

বাংলার কালী কথা ৮
কৌশিক কর্মকার

কংগ্রেস ও আরশোলাদের হাত থেকে
ভারতীয় গণতন্ত্রকে বাঁচান জরুরী ১১
অধ্যাপক ডঃ অয়ন ব্যানার্জী

'তান্ডব' নয়, গেরুয়াই ভরসা
প্রমাণ করল রেজিনগর-নন্দীগ্রাম ১৬
জয়ন্ত গুহ

ছবিতে খবর ১৮

ছেচল্লিশের নোয়াখালীঃ
যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই ২৪
বিনয়ভূষণ দাশ

বিজন সেতু গণহত্যাঃ
লাল সন্ত্রাসের আলোকে অমীমাংসিত করুন প্রেক্ষাপট ২৭
রুবী সাঁই

মক্কা-প্যাক্টঃ আবেগ না নয়া বাস্তব? ৩১
ডঃ অনিকেত মহাপাত্র

সম্পাদক: জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়
কার্যনির্বাহী সম্পাদক : অধ্যাপক ডঃ অয়ন ব্যানার্জী
সহযোগী সম্পাদক : জয়ন্ত গুহ
সম্পাদকমন্ডলী:
অভিরূপ ঘোষ, কৌশিক কর্মকার, শুভজিৎ আওন, অনিকেত মহাপাত্র
সার্কুলেশন: সঞ্জয় শর্মা

সম্পাদকীয়

বিরোধী দলনেতা যখন ছিলেন তখন কিন্তু একেবারেই বোঝা যায়নি। মুখ্যমন্ত্রী পদে দায়িত্ব গ্রহণের পর বোঝা যাচ্ছে শুভেন্দুবাবুর রসবোধ। এ রসবোধ অনন্য। এ স্বাদের কোনও ভাগ হবেনা। সরাসরি নাম ধরে বলছেন না। এক্ষেত্রে তিনি আপাদমস্তক ভদ্রলোক। কিন্তু যা বলছেন এবং যে স্টাইলে বলছেন, শুনে তো হেসে অস্থির সাধারণ মানুষ এবং বিজেপি কর্মীরা।

সম্প্রতি এক ডেঁপো ছোকরা মন্তব্য করেছিল যে, পুলিশ প্রশাসন ও আধিকারিকরা শুভেন্দু অধিকারীর অঙ্গুলিহেলনে কাজ করছেন এবং রাজ্যে সরকার বদল হলে কাউকে ছাড়া হবে না। এ নিয়ে শুভেন্দুবাবুকে প্রশ্ন করতেই তাঁর জবাব, "আমার যা মনে হচ্ছে, ওঁর যে পিএ টাকা তুলত, সে জেরায় সব সত্য উগরে দিয়েছে। ডায়মন্ড হারবার পুলিশ তাঁকে পুলিশ হেফাজতে (পিসি) নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করায় সব সত্য সামনে চলে এসেছে। আর সেই ভয় ও প্যানিক থেকেই ওঁর শরীরে সোডিয়াম-পটাশিয়ামের সমস্যা হয়ে গিয়েছে।" বোঝো কাণ্ড। অন্য সবাই হেসে গড়িয়ে পড়লেও যাকে নিয়ে তিনি এই রসিকতা করলেন তাঁর তো এবার নিশ্চয়ই সোডিয়াম-পটাশিয়ামের সমস্যা হবে। হবেই।

বারুইপুরে 'গণতন্ত্র বাঁচাও' কর্মসূচি। সেখানেও তাঁর রসিকতার ঝলক। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলছেন, সিপিএমের অত্যাচার থেকে বাংলাকে বাঁচাতে একসময় তৃণমূলের জন্ম হলেও, অটল বিহারী বাজপেয়ীর তা জানা থাকলেও আজ সেই দলই সিপিএমের সঙ্গে দোস্তি করছে। বেবি আর আন্টি এখন একসঙ্গে চা খাচ্ছেন- উফফ। "বেবি আর আন্টি এখন একসঙ্গে চা খাচ্ছেন"- ছক্কা। স্টেডিয়ামের বাইরে বল। সবাই বুঝতে পারছে। কেউ হেসে গড়িয়ে পড়ছে। কেউ জ্বলছে চিড়বিড় করে কিন্তু এমন ছক্কা তাকিয়ে তাকিয়ে দ্যাখা ছাড়া কিসসু করার নেই। থাকেনা।

এমন হাত চালিয়ে যখন কেউ খেলে সাধারণত তখন চুপচাপ থাকাই ভাল। কিন্তু 'দুই খোকা'কে সেকথা বোঝাবে কে? এক 'দিল্লির খোকা'। আর এক 'কালীঘাটের খোকা'। বারুইপুরের জনসভায় শুভেন্দুবাবু বলেছিলেন, সাত লক্ষ ভোটে জিতেছে উনি, কিন্তু নির্বাচনের পর গত ছয় মাস তাঁকে কোথায় পাওয়া গেল? তোমার দেখা নাই রে, তোমার দেখা নাই!

কিছুক্ষণের মধ্যেই 'কালীঘাটের খোকাবাবু' উত্তর দিলেন, দল যদি সুযোগ দেয় তবে তিনি আগামী দিনেও ডায়মন্ডহারবার কেন্দ্র থেকেই প্রার্থী হয়ে লড়বেন। হাস্যকর। 'দল যদি সুযোগ দেয়' মানে? কোন দল? যে দল টিমটিমে প্রদীপের মতো জ্বলছে সেই দল নিয়ে কথা বলা অনেকটা 'পাতকুয়ো-র রাঘববোয়ালের' মত শোনায়।

হাতি ঘোড়া গেল তল। মশা বলে কত জল!

স্বয়ংসেবক থেকে প্রধানমন্ত্রী

দেশসেবা-সংগঠন ও সংকল্পের এক অসাধারণ যাত্রা



সুনীল বনসল
(সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক, বিজেপি)

ভারতের রাজনীতির ইতিহাসে এমন কয়েকজন ব্যক্তি রয়েছেন যাঁদের যাত্রা শুধুমাত্র ক্ষমতার অলিন্দে আটকে থাকেনি। তাঁরা সংগঠন তৈরি, আদর্শ, জনসেবা এবং রাষ্ট্রগঠনের একটা লম্বা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গিয়েছেন। নরেন্দ্র মোদির রাজনৈতিক যাত্রাকেও এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখা উচিত। তাঁর যাত্রা হল এমন এক স্বয়ংসেবকের যাত্রা, যিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) শাখা থেকে জনসেবা করার আদর্শ পেয়েছেন। ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) সংগঠনের মধ্যে দিয়ে নিজের পরিচয় লাভ করেছেন। গুজরাতকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। এবং প্রধানমন্ত্রী হিসেবে জাতীয় রাজনীতির একবারে কেন্দ্রে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন।

২০০১ সালের ৭ অক্টোবর নরেন্দ্র মোদি গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন। ২০২৬ সালে তিনি সরকারের প্রধান হিসেবে ২৫ বছর পূর্ণ করলেন। এই সময়ের মধ্যে মানুষের জীবনযাত্রার উন্নয়নে এবং দেশের প্রগতির ক্ষেত্রে তাঁর ধারাবাহিক প্রচেষ্টা ও অবদান রয়েছে।

কিন্তু নরেন্দ্র মোদির জীবনের কাহিনী ২০০১ থেকে শুরু হয়নি। তাঁর এই দীর্ঘ যাত্রার পিছনে রয়েছে দশকের পর দশকের সাংগঠনিক জীবন, শৃঙ্খলা এবং আদর্শগত প্রশিক্ষণ।

আরএসএস-এর স্বেচ্ছাসেবক থেকে দেশের সেবক

নরেন্দ্র মোদির জনসেবার জীবনের বিকাশ ঘটেছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে। তাঁর সংঘজীবন শুরু হয় আহমেদাবাদে। পরবর্তীকালে তিনি প্রচারকের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর ব্যক্তিত্বের পটভূমিকে বুঝতে গেলে এই আরএসএস-এর স্বেচ্ছাসেবকের ভূমিকাটা জানা খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, স্বেচ্ছাসেবকের জীবনে সংগঠন, শৃঙ্খলা, রাষ্ট্রবাদের প্রতি দায়বদ্ধতা এবং সমাজের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে কাজ করার বিষয়ে জোর দেওয়া হয়।

এরপর তিনি ভারতীয় জনতা পার্টির সংগঠনে সক্রিয় হন। বিভিন্ন স্তরে দলের সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করতে করতে জাতীয় রাজনীতিতে এগিয়ে যান। সেই কারণে নরেন্দ্র মোদির রাজনীতির শৈলী শুধুমাত্র নির্বাচনী রাজনীতি দিয়ে বোঝা অসম্পূর্ণ হবে। তাঁর রাজনৈতিক যাত্রার একটা গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হল, সংগঠন তৈরি করা এবং কর্মীকেন্দ্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতি নির্মাণ।

২০০১ সালের ৭ অক্টোবর নরেন্দ্র মোদি যখন গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব নেন,



তখন রাজ্যটি একটি কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল। ২০০১ সালে কচ্ছে বিশাল ভূমিকম্প হয়। খরা, সাইক্লোন ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগও তার আগে ঘটে। মোদি তাঁর বিভিন্ন বিবৃতিতে এই প্রসঙ্গগুলির কথা বলেছেন। কিন্তু এরপরই মোদি গুজরাতে সুশাসনের এমন এক মডেল তৈরি করার চেষ্টা করেন, যেখানে অগ্রাধিকার পায় পরিকাঠামো নির্মাণ, লগ্নি, বিদ্যুৎ, কৃষি, প্রশাসনিক সংস্কার এবং সার্বিক উন্নয়ন। গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে মোদী ১৩ বছর দায়িত্ব পালন করেন। এটা তাঁর প্রশাসনিক অভিজ্ঞতার গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি, যা পরবর্তীকালে তাঁর জাতীয় ভূমিকাতেও অবদান রেখেছে।

এই গুজরাতের অধ্যায়টি হল জাতীয় রাজনীতিতে নরেন্দ্র মোদির পরিচয় নির্মাণের ক্ষেত্রে একটি ভিত্তি। গুজরাত মডেল কালক্রমে ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে তাঁর প্রচারের মূল ধারণা হয়ে ওঠে।

বিজেপি নেতা থেকে প্রধানমন্ত্রী

২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচন ছিল ভারতীয় রাজনীতির একটি নির্ণায়ক মোড়। নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে লোকসভায় বিজেপি পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। ২০১৪ সালের ২৬ মে তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন। ২০১৯ সালে বিজেপি আবার পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। ২০২৪ সালে নরেন্দ্র মোদি তৃতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন। তাঁর এই যাত্রার একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিক হল, একজন সাধারণ সাংগঠনিক কর্মী থেকে দেশের সর্বোচ্চ নির্বাচিত প্রশাসনিক দায়িত্বে উত্তরণ।

২০১৪-র পর থেকে নরেন্দ্র মোদি তাঁর নিজের সঙ্গে 'প্রধান সেবক' ধারণাটি জড়িয়ে নেন। তাঁর সমর্থকদের কাছে এই শব্দটি তাঁর রাজনৈতিক শৈলীর একটা প্রতীক হয়ে ওঠে। এই শৈলীটা হল— ক্ষমতা কোনও বিশেষ অধিকার নয়, একটা দায়িত্ব।

'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ' থেকে 'বিকশিত ভারত'

প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নরেন্দ্র মোদির শাসন বৃহৎ আকারের জনকল্যাণ এবং উন্নয়নমূলক প্রকল্পের জন্য পরিচিত। এই উদ্যোগগুলির মধ্যে রয়েছে 'জনধন যোজনা', 'স্বচ্ছ ভারত অভিযান', 'উজ্জ্বলা যোজনা', 'প্রধানমন্ত্রী আবাসন যোজনা', 'আয়ুষ্মান ভারত' এবং 'ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার'। যেগুলি লক্ষ লক্ষ উপভোক্তার কাছে পৌঁছনোর চেষ্টা করেছে।

গরিব মানুষের কল্যাণকে সরকার তার প্রধান অগ্রাধিকারের তালিকায় রেখেছে। আবাসন, স্যানিটেশন, ব্যাঙ্কিং, রান্নার গ্যাস, স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং খাদ্য নিরাপত্তার মতো জীবনযাত্রার মৌলিক প্রয়োজনগুলিকে ঘিরে প্রকল্পগুলি রচনা হয়েছে। এই সমস্ত কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্যই হল, গরিব এবং সমাজের দুর্বল অংশের কাছে মৌলিক সুবিধাগুলি এবং আর্থিক সুযোগগুলি পৌঁছে দেওয়া।

'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ'-এর রাজনৈতিক ধারণা একটা ক্রম বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গিয়েছে। এবং তা 'সবকা প্রয়াস'-এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ও 'বিকশিত ভারত'-এর বৃহত্তর জাতীয় লক্ষ্যে পৌঁছেছে।

ডিজিটাল ইন্ডিয়া: শাসনের একটা পরিবর্তিত ছবি

মোদি যুগের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল ভারতের জনজীবনের দ্রুত ডিজিটাইজেশন। ডিজিটাল পেমেন্ট, ইউপিআই, আধারভিত্তিক পরিষেবা, ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার এবং ডিজিটাল গণপরিকাঠামো নাগরিকদের সঙ্গে সরকারের আদানপ্রদানের রূপ বদলে দিয়েছে।

ভারতের ডিজিটাল সক্ষমতা আন্তর্জাতিক মঞ্চেও গুরুত্ব পেয়েছে। ২০২৩ সালে ভারতের জি২০-র সভাপতিত্বের সময় দেশ ডিজিটাল গণপরিকাঠামো নির্মাণে, গ্লোবাল সাউথে এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের গুরুত্ব দিয়েছিল। এই পরিবর্তন শুধুমাত্র একটা প্রযুক্তিগত রূপান্তর ছিল না। এটার সঙ্গে জড়িয়ে ছিল শাসনকে আরও সরাসরি দ্রুত এবং নাগরিক কেন্দ্রিক করার বৃহত্তর চেষ্টা।

গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের মধ্যে দিয়ে নেতৃত্ব

প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নরেন্দ্র মোদির আমলে এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হয়েছে যার প্রভাব ভারতীয় রাজনীতি এবং অর্থনীতিতে সুদূর প্রসারী। এরমধ্যে রয়েছে ২০১৬ সালের বিমুদ্রাকরণ, ২০১৭ সালে জিএসটির সূচনা, ২০১৯ সালে জম্মু ও কাশ্মীরের বিষয়ে সাংবিধানিক পরিবর্তন, নাগরিকত্ব সংশোধন আইন, নয়া শিক্ষানীতি এবং ফৌজদারি আইনের পরিবর্তন। সাম্প্রতিককালে তাঁর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের উদাহরণ।

এই সিদ্ধান্তগুলির পক্ষে যেমন সমর্থনও এসেছে, তেমন সমালোচনাও হয়েছে। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার এটি একটি স্বাভাবিক অংশ। যে কোনও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের প্রকৃত পরীক্ষা হল তার দীর্ঘকালীন ফলশ্রুতি, নাগরিকদের অভিজ্ঞতা এবং তার প্রাতিষ্ঠানিক প্রভাব।

বিশ্বমঞ্চে নতুন ভারতবর্ষ

গত এক দশকে বিশ্বমঞ্চে ভারতের ভূমিকা নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বের একটি বিশেষ দিক হয়ে উঠেছে। 'কোয়াড', 'জি২০', 'গ্লোবাল সাউথ', 'আন্তর্জাতিক সৌর জোট' এবং অন্যান্য বহুপাক্ষিক মঞ্চে ভারত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

২০২৩ সালে জি২০-তে ভারতের সভাপতিত্ব বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। নয়াদিল্লির জি২০ শীর্ষ সম্মেলনে আফ্রিকান ইউনিয়নকে স্থায়ী সদস্য করা হয়। এটি হল ভারতের কূটনৈতিক অগ্রাধিকারকে গুরুত্ব দেওয়ার একটি বড় নিদর্শন এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গ্লোবাল সাউথের ভাবনাগুলিকে তুলে ধরা।

মোদির বিদেশনীতির একটি প্রধান বার্তা হল ভারত বিশ্বব্যবস্থায় শুধু একজন অংশগ্রহণকারী হিসাবে থাকবে না, প্রভাব তৈরি করতে সক্ষম একটি সক্রিয় রাষ্ট্রের ভূমিকা নেবে।

স্বেচ্ছাসেবকের মূল্যবোধ এবং প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব

প্রধানমন্ত্রীর যাত্রাকে বুঝতে গেলে 'স্বেচ্ছাসেবক' শব্দটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। সংঘ পরিবার থেকে তিনি সাংগঠনিক মূল্যবোধ পেয়েছেন। বিজেপি কর্মী হিসাবে তাঁর দীর্ঘ



পরিশ্রম এবং প্রশাসনিক নেতৃত্বের অভিজ্ঞতা। এই তিনটি পর্ব তাঁর রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে রূপ দিয়েছে। সেই কারণে তাঁর রাজনীতিতে সংগঠন, কর্মী এবং গণ-অংশগ্রহণ বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। প্রধানমন্ত্রী হয়েও তিনি প্রায়শই নিজেকে জনগণের সেবক হিসাবে বর্ণনা করেন।

২০২৫ সালে প্রশাসনিক জীবনের ২৫ বছরে পা দেওয়ার পর তিনি বলেছিলেন, দেশসেবা সবচেয়ে বড় সম্মান এবং কর্তব্য। সংবিধানের মূল্যবোধ দ্বারা পরিচালিত হয়ে 'সমষ্টিগত লক্ষ্য' 'বিকশিত ভারত' অর্জনের জন্য তিনি আরও কঠোর পরিশ্রম করবেন বলে জানিয়েছিলেন।

২৫ বছর: লক্ষ্য অর্জনের উর্ধ্বে এক কাহিনী

জনজীবনে ২৫ বছর ব্যতিক্রমীভাবে একটা লম্বা সময়। নরেন্দ্র মোদির ক্ষেত্রে এই সময়টা তিনটি নির্দিষ্ট ভূমিকায় প্রসারিত— আরএসএস-এর স্বেচ্ছাসেবক, বিজেপি সংগঠক ও নেতা এবং গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী।

এই ২৫ বছরে ভারতও অনেক রূপান্তরের সাক্ষী থেকেছে। অর্থনীতি, প্রযুক্তি, পরিকাঠামো, ডিজিটাল পেমেন্ট, সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প, বিদেশনীতি এবং রাজনৈতিক দর্শনে অনেক পরিবর্তন এসেছে। দেশ এই রূপান্তরগুলিকে তাঁর নেতৃত্বের কৃতিত্ব হিসাবে দেখে।

স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে মোদির অবদান

এ ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই যে স্বাধীনতার পর ভারতের সবচেয়ে প্রভাবশালী এবং পরিবর্তনকারী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নরেন্দ্র মোদির স্থান উঁচুতে। শুধুমাত্র নির্বাচনী সাফল্য দিয়ে তাঁর অবদান বিচার করা ঠিক নয়। তাঁর শাসনের একটা নিজস্ব শৈলী, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে দ্রুততা, কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলির সম্প্রসারণ, ডিজিটাল রূপান্তর, বিশ্ব কূটনীতি এবং দেশের জন্য দীর্ঘকালীন লক্ষ্যস্থাপন এক্ষেত্রে বিচার্য।

যে কোনও নেতৃত্বের প্রকৃত অবদান সময় বিচার করে। তাঁর সিদ্ধান্তের ফলশ্রুতি, প্রতিষ্ঠানের উপর তাঁর প্রভাব, নাগরিক জীবনে পরিবর্তনের অভিজ্ঞতা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উপর প্রভাব দিয়ে তা বিচার হয়। এই অর্থে নরেন্দ্র মোদির ২৫ বছর স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে একটি সোনালি অধ্যায়।

সেবা থেকে সংকল্প

সংঘের শাখা থেকে যে যাত্রা শুরু হয়েছিল, তা গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর হয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর পদে পৌঁছেছে।

একটি সংগঠনে কাজ করা একজন কর্মী, দেশকে নেতৃত্ব দেওয়া একজন নেতা এবং গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য অর্জনে আহ্বান জানানো একজন প্রধানমন্ত্রী।

যদি তাঁর ২৫ বছরের এই যাত্রাকে একটি বাক্যে লিখতে হয়, তাহলে বলতে হবে: এটি ক্ষমতার যাত্রার চেয়েও বেশি দায়িত্ববোধের যাত্রা; পদের যাত্রা থেকে বেশি সেবার যাত্রা; একজন ব্যক্তির যাত্রার চেয়ে বেশি একটি স্বপ্ন এবং ভারতের একটি সংস্কৃতির যাত্রা—

যা তিনি বিকশিত ভারতের মধ্যে দিয়ে দেখতে চান।

পশ্চিমবঙ্গে ঠান্ডা পানীয় আর খাদ্যসামগ্রীর কারখানা গড়বে

রিলায়্যান্স কনজিউমার্স



প্রায় ১,৩০০ কোটি টাকা ব্যয়ে হরিণঘাটায়
৩৫ একর জমিতে হবে কারখানা

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে হবে প্রায়
৬০০০ কর্মসংস্থান



বিজেপি

শিল্পায়নে গতি, কর্মসংস্থানের নতুন সম্ভাবনার পথে রাজ্য

/BJP4Bengal bjpbengal.org



বাংলার কালী কথা

কৌশিক কর্মকার

'কালী- অন্ধকারসমাচ্ছন্ন কালিমাময়ী। হৃতসর্ব্বস্বা, এই জন্য নগ্নিকা। আজি দেশে সর্ব্বত্রই শ্মশান- তাই মা কঙ্কালমালিনী। আপনার শিব আপনার পদতলে দলিতেছেন- হায় মা!' ব্রহ্মচারীর বয়ানে বঙ্কিমচন্দ্র কালীর রূপ বর্ণনা করেছেন তাঁর উপন্যাস 'আনন্দমঠে'র পৃষ্ঠায়।

শরৎ-হেমন্তের সন্ধিক্ষণে বাংলায় আসে দীপান্বিতা কালীপূজা। সারা বছরের বিভিন্ন সময়ে রটন্তী কালীপূজা, ফলহারিনী কালীপূজা প্রভৃতি বহুবিধ কালীপূজার মাঝে বাংলায় সবচেয়ে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে এই দীপান্বিতা কালীপূজা। নদিয়া-রাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময় থেকে কালীপূজা অত্যন্ত সুপ্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে। তাঁর নির্দেশনায় ও পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলায় কালীপূজার সংখ্যা প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। এর সঙ্গে সঙ্গে অষ্টাদশ শতকে সূত্রপাত হয় এক অপূর্ব সাহিত্যসম্ভারের যা শাক্ত পদাবলী বা শ্যামা সঙ্গীত নামে পরিচিত। এই কালীপূজার সঙ্গে সম্পৃক্ত শাক্ত গানগুলি বাংলার প্রকৃতির মত বাঙালির কাছে অত্যন্ত অনায়াস ও আন্তরিক। আপামর বাঙালির সামূহিক স্মৃতির অন্তর্গত হয়ে আছে এই শাক্তপদ তথা শ্যামা সংগীতগুলি। এই শ্যামা সংগীতগুলি শুনলেই যে বিষয়টি অনুধাবন করা যায় তা হল ত্যাগের শ্রেষ্ঠত্ব, নিরহংকারী জীবনযাপন, বিষয়কে বিষবৎ পরিত্যাগ করে মায়ের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের কথা গানগুলিতে বর্ণিত হয়েছে। ভারতীয় আধ্যাত্মিক সাধনার মূল সুরটিও ঠিক এরকমই। এখানে সব সময়ই ত্যাগকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। সে কারণেই শাক্ত গানের মধ্য দিয়ে জগজ্জননী মায়ের কাছে ভক্তের নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ রচিত হয়েছে। শাক্ত পদাবলীর পরিসরে পাঠক খুঁজে পায় আত্মদর্শনের রূপরেখা, জীবনজিজ্ঞাসার উত্তর; ভোগে নয়, ত্যাগে ও চূড়ান্ত আত্মসমর্পণেই যে মানুষের মুক্তি তা বাংলার নিজস্ব উপমা, রূপকের আশ্রয়ে প্রকাশ পেয়েছে শাক্ত পদাবলীর পংক্তিতে।

কালী যেমন ভক্তের আশ্রয়দাত্রী ঠিক তেমনই শক্তিস্বরূপা, বরাভয় প্রদানকারিণী; ঠিক এ কারণেই স্বাধীনতা পূর্ব সময়ে বাংলার বিপ্লবী সমাজের আদর্শের প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন মা কালী। স্বদেশী বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে সমার্থক হয়ে আছে অনুশীলন সমিতির নাম। অনুশীলন সমিতির নতুন কোন সভ্যের দীক্ষাগ্রহণ বা প্রতিজ্ঞাকরণ অনুষ্ঠিত হত দেবী মন্দিরে, তা হতে পারে রমনা কালীবাড়ি বা সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দির। মা কালীর সামনে অস্ত্র পূজা করে, তাঁরা নিজ দেশের জন্য আত্মোৎসর্গের শপথ নিতেন। সে কারণে বিপ্লবীরা নিজেরাও বহু স্থানে কালী পূজার সূচনা ঘটিয়েছিলেন। বিপ্লবীদের সূচিত এই কালী পূজাগুলি কালক্রমে অনেকাংশে বন্ধ হয়ে গেছে; কিয়ৎক্ষেত্রে কোনরকমে পূজা হয়ে চলেছে। এমনই কালীপূজা মেদিনীপুর শহরের কর্ণেলগোলা মন্দিরের পুজো যা প্রায় ২৫০ বছরের পুরনো। এই কালী মন্দিরেই দীক্ষা নিয়েছিলেন ক্ষুদিরাম বসু। বিপ্লবের জন্য অস্ত্র শিক্ষা ও মানসিক প্রস্তুতি নেওয়ার পর এই মন্দিরের শপথ নিতেন বিপ্লবীরা। কিংবা কর্ণেলগোলা থেকে কিছুটা দূরে লালদিঘী পূর্বপাড়ার কালীপূজা; এই পুজোগুলি ঐতিহ্যমণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও আজ আর্থিক সংকটের সম্মুখীন। আজকের এই থিমনির্ভর পুজো-উৎসবে যে অজস্র অর্থ ব্যয় হয়, যার মধ্যে কেবল আছে জাঁকজমক, আছে জৌলুস; কিন্তু কোন প্রাণ নেই, ভক্তি নেই। কিন্তু রামপ্রসাদ সেন সেই অষ্টাদশ শতাব্দীতেই বলে গেছেন 'জাঁকজমকে করলে পূজা অহংকার হয় মনে মনে। তুমি লুকিয়ে তারে করবে পূজা, জানবে নারে জগজ্জনে।' অর্থাৎ আমাদের যে পূজার আদর্শ, সেই আদর্শ থেকে আমরা ক্রমবিচ্যুত হয়ে চলেছি। তার ফলও আমরা হাতেনাতে পাচ্ছি। শ্রদ্ধাহীন পূজা গুরুত্বহীন; তা অকল্যাণকর। ভক্তিহীন ত্যাগহীন মূল্যবোধহীন এই উৎসব সর্বস্ব পূজায় মানুষের প্রাণ যাচ্ছে, ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে। আমরা অনায়াসেই বলতে পারি বর্তমানে এই বিচ্যুতি প্রবল আকার ধারণ করেছে; তা মাত্রাছাড়া পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। আমাদের ফিরতে হবে এই দেখনদারি থেকে ভক্তিসর্বস্ব পূজায়। তবেই পূজার



উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। আমরা ক্রমশ এগিয়ে চলেছি আদর্শহীনতার পথে, অন্ধকারসমাছন্ন এই আবহে নিষ্ঠা ও ভক্তিপূর্ণ মাতৃবন্দনাই হোক আমাদের পাথেয়।

আজ অবিভক্ত বাংলার দুই তৃতীয়াংশ আমাদের হাতছাড়া। ওপার বাংলার সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় ভোগের আদর্শে নিবেদিত; যা ভারতীয় আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত। তাদের আদর্শ অনুযায়ী পরকালে রয়েছে অজস্র ভোগের সামগ্রী এবং সেই ভোগের লালসায়, হাতছানিতে তারা ক্রমাগত সংখ্যালঘু হিন্দু, পুজোপাসকদের প্রাণহানিতে নিয়োজিত। মায়ের মৃন্ময় মূর্তির ধ্বংসের খবরে ওপার বাংলায় মায়ের আগমনের খবর মেলে। এই প্রকৃতির যা কিছু সুন্দর, সবই তাদের কাছে 'হারাম'। যে কাশফুল এপার বাংলায় মায়ের আগমন বার্তা বয়ে নিয়ে আসে, তাদের কাছে সেই কাশফুল 'হারাম'; সেই কাশফুল পোড়ানো হচ্ছে আজকের বাংলাদেশে। প্রতিদিন হিন্দু হত্যা, হিন্দু ধর্ষণ, হিন্দুর সম্পত্তি দখল, হিন্দুর কন্যা অপহরণ ঘটে চলেছে। এই অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে লড়তে গেলে আজ শক্তিময়ী কালীর উপাসক হতে হবে। বিপ্লবীদের অস্ত্রচর্চা, অস্ত্রপূজার অভ্যাস ফিরিয়ে আনতে হবে। কালীমায়ের নামে শপথ নিতে হবে। ধর্ম রক্ষা, নিজ সংস্কৃতি রক্ষার মাধ্যমে তবেই এই জাতি নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারে। স্বাধীনতা সংগ্রামের চরমপন্থী আন্দোলনের ইতিহাসে আমাদের বীর বিপ্লবীদের যেসব অকুতোভয় কর্মকাণ্ড সাধারণ মানুষকে উজ্জীবিত করত, স্বাধীনতার স্পৃহায় সকলকে নিয়োজিত করত, সেই শক্তির উপাসনা আজ প্রয়োজন এই অপশক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য। সেকুলার মনন, সেকুলার চিন্তা আমাদের বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না। ঠিক যে মুহূর্তে এই লেখাটি লেখা হচ্ছে, সেই মুহূর্তে খবর এলো ওপার বাংলার এক নিরীহ হিন্দু স্কুল শিক্ষক মনোরঞ্জন রায়কে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে। দুই মুসলমানের ব্যক্তি সম্পত্তির প্রতিদ্বন্দ্বে সালিশি করতে গিয়ে নিহত হয়েছেন তিনি। গত ৫ অগস্ট ২০২৪ এর পর এমন একটি দিনও যায়নি, যেদিন সংখ্যালঘু হিন্দু নির্যাতিত হয়নি। ২০২১ খ্রিস্টাব্দের শারদীয় দুর্গাপূজা ওপার বাংলায় অভিহিত হয়েছে 'রক্তাক্ত শারদ' অভিধায়। ওপার বাংলা তথা বাংলাদেশে ২০২১ খ্রিস্টাব্দের শারদীয় দুর্গাপূজার আনন্দ ম্লান হয়ে গিয়েছিল সংখ্যাগুরু মৌলবাদী গোষ্ঠীর বীভৎস ও নৃশংস আক্রমণে। কেবল পূজা মন্ডপ, প্রতিমা কিংবা মন্দির নয়; আপামর হিন্দু সংখ্যালঘুর বাসস্থান, ঘরবাড়ি, ধানের গোলা আক্রমণ করে ধুলোয় মিশিয়ে দেয় এই ধর্মান্ধ গোষ্ঠী। বাংলাদেশের ২৩টি জেলায় আধা-সামরিক বাহিনী মোতায়েন করতে হয়। ওপার বাংলায় হিন্দুদের উপর, হিন্দুদের উপাস্য দেবীমুর্তির উপর এহেন আক্রমণ যে নতুন কিছু নয়, তা যে আবহমানকাল ধরে চলে আসছে, তা বোঝা যায় শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তীর লেখা 'জেলে ত্রিশ বছর ও পাক-ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম' গ্রন্থে উল্লিখিত বিগত শতাব্দীর প্রথমার্ধের একটি ঘটনা থেকে: 'সাটিরপাড়ার নিকট চিনিশপুর কালীবাড়ী অবস্থিত। ইহা প্রসিদ্ধ পীঠস্থান। সম্ভবতঃ বৈশাখ মাসে, কোন এক তিথিতে (অমাবস্যা), সেখানে হাজার হাজার লোক পূজা দিতে আসে। এই পূজায় চার-পাঁচশ পাঁঠা এবং পাঁচ-সাতটা মহিষ বলি পড়ে। একবার গুজব রটিল যে, এই পূজার দিন মুসলমানেরা কালীবাড়িটি আক্রমণ করিবে। আমি মফঃস্বল সমিতির সম্পাদকগণকে সংবাদ দিলাম, সেইদিন প্রাতে লাঠিসহ সকলকে উপস্থিত থাকিতে হইবে। প্রায় পাঁচ শত স্বেচ্ছাসেবক ঐ দিন উপস্থিত হইল। প্রথমে তাহাদিগকে 'কুচকাওয়াজ' করাইলাম, পরে যাত্রীদের সুবিধার জন্য তাহাদের নানা কাজে বিভক্ত করিয়া দিলাম। সন্ধ্যা পর্যন্ত আমরা সেখানে উপস্থিত ছিলাম, কোন দুর্ঘটনা ঘটে নাই এবং যাত্রীরা সকলে বিদায় হইলে আমরাও প্রত্যাবর্তন করিলাম।'

'কালী- অন্ধকারসমাচ্ছন্ন কালিমাময়ী। হৃতসর্ব্বস্বা, এই জন্য নগ্নিকা। আজি দেশে সর্ব্বত্রই শ্মশান- তাই মা কঙ্কালমালিনী। আপনার শিব আপনার পদতলে দলিতেছেন- হায় মা!' ব্রহ্মচারীর বয়ানে বঙ্কিমচন্দ্র কালীর রূপ বর্ণনা করেছেন তাঁর উপন্যাস 'আনন্দমঠে'র পৃষ্ঠায়। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে বিপ্লবী মতাদর্শের পশ্চাতে মূল আদর্শ হিসেবে কাজ করেছে 'আনন্দমঠ'; 'আনন্দমঠে'ই উচ্চারিত হয়েছিল সেই 'বন্দেমাতরম' বাণী, যা শাসক ইংরেজের হৃদয়ে কম্পন ধরিয়ে দিয়েছিল। বিপ্লবী সমাজের কাছে বেদগ্রন্থ ছিল 'আনন্দমঠ'। মা কালীর নামে দেশের বিপ্লবী সমাজ একত্রিত হয়েছিলেন; মা কালীর প্রতি একান্ত ভক্তিই তাঁদের এই পথে নিয়ে এসেছিল; ভক্তি যা কিনা আত্মত্যাগের চেয়েও গরিমাময় ও ঐশ্বর্যশালী; 'আনন্দমঠে'র উপক্রমণিকাতেই সেই 'ভক্তি'র জয়গান ধ্বনিত হয়েছে: 'তোমার পণ কি?/ পণ আমার জীবনসর্বস্ব।/ জীবন তুচ্ছ; সকলেই ত্যাগ করিতে পারে।/ আর কি আছে? আর কি দিব?/ ভক্তি।' কেবল ভক্তি কি আমাদের ধর্ম, আমাদের সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে পারবে? ভক্তিকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজন শক্তি; যার নিদারুণ অভাব অনুভব করেছিলেন ঋষি অরবিন্দ। 'আনন্দমঠে'র পাশাপাশি অপর যে গ্রন্থটি বিপ্লবী সমাজকে চূড়ান্ত সংগ্রামের লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধ করেছিল, তা হল ঋষি অরবিন্দের 'ভবানী মন্দির'। 'ভবানী মন্দিরে'র পরিসরে অরবিন্দ খুব জোরের সঙ্গে জানিয়েছেন 'শক্তি ছাড়া ভক্তি নির্জীব', তিনি আরও বলছেন 'জ্ঞানও শক্তির অভাবে মৃত'। একুশ শতকের বাঙালিকে অনুধাবন করতে হবে শক্তির সাধনা, শক্তির চর্চা ছাড়া তাঁর জ্ঞানের টইটুম্বুর জগৎ, তাঁর ভক্তির পরাকাষ্ঠা মুহূর্তে ধূলিসাৎ হয়ে যাবে! আসন্ন কালীপূজার মাহেন্দ্রক্ষণই আমাদের শক্তি সাধনার সূচক বিন্দু হয়ে উঠুক, অশুভ শক্তির বিনাশে আমরা যেন ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াইয়ের জন্য ব্রতী হয়ে উঠি।

সহায়ক গ্রন্থ/সূত্র:

১। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আনন্দমঠ

২। শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায় (সম্পা.), শাক্ত পদাবলী

৩। শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী, জেলে ত্রিশ বছর ও পাক-ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম

৪। এই সময় অনলাইন



কংগ্রেস ও আরশোলাদের হাত থেকে ভারতীয় গণতন্ত্রকে বাঁচান জরুরী

অধ্যাপক ডঃ অয়ন ব্যানার্জী

কংগ্রেস বিগত কয়েক বছর ধরে নির্বাচনে হারলেই কিছু অজুহাত খুঁজে বার করছে। কংগ্রেস কখনো কোন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান আবার কখনো নির্বাচনী প্রক্রিয়ার ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছে। কখনও তারা সুপ্রিম কোর্টকে প্রশ্ন করছে, কখনও নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলছে, কখনও আবার ইভিএম নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে। বিশেষ নিবিড় সংশোধন (SIR) নিয়েও কংগ্রেস ও অন্যান্য বিরোধীরা বারবার অভিযোগ তুলেছে। ভারতের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে তারা ধারাবাহিকভাবে আক্রমণ করে চলেছে। এই অভিযোগগুলি কি সত্যিই নির্বাচনী স্বচ্ছতা ও সততা নিয়ে প্রকৃত উদ্বেগের প্রকাশ, নাকি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির উপর জনগণের আস্থা নষ্ট করার একটি রাজনৈতিক কৌশল?

যখন প্রমাণের বদলে অভিযোগকে এবং নির্বাচনে পরাজয়ের পর প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রশ্নবিদ্ধ করাকেই রাজনৈতিক হাতিয়ার করা হয়, তখন বোঝা যায়— জনগণের রায় মেনে নিতে না-পারা দলগুলি ক্ষমতা দখলের জন্য অন্য পথ খুঁজছে। তারা বিভিন্ন দেশে শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটানোর জন্য ব্যবহৃত প্রচলিত ষড়যন্ত্রমূলক কৌশলগুলিই অনুসরণ করছে।



কিন্তু ভারত একটি আত্মবিশ্বাসী, সার্বভৌম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। আমাদের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে দুর্বল করার এই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচেষ্টা এখানে সফল হবে না।

স্বাধীন ভারতে ২০২৫ সালের আগেও বহুবার SIR হয়েছে। ১৯৫২–১৯৫৬, ১৯৫৭, ১৯৬১, ১৯৬৫, ১৯৬৬, ১৯৮৩–১৯৮৪, ১৯৮৭–১৯৮৯, ১৯৯২–১৯৯৩, ১৯৯৫, ২০০২–২০০৩, ২০০৪। উপরিউক্ত ১১ টির মধ্যে ১০ বার কংগ্রেস-নেতৃত্বাধীন সরকারের আমলে SIR পরিচালিত হয়েছিল।

SIR কী?

SIR হল ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (Special Intensive Revision)। ভোটার তালিকা যাচাই ও সংশোধন করা নির্বাচন কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব। কংগ্রেস যখন S I R পরিচালনা করেছিল, তখন তারা একে বৈধ ও যুক্তিসংগত বলেছিল। কিন্তু অন্য কোনও দল একই কাজ করলে তারা একে গণতন্ত্রের উপর আক্রমণ বলে দাবি করে। এই দ্বিচারিতা কেন? কংগ্রেসের এই ক্ষোভ আসলে ভণ্ডামি ছাড়া আর কিছুই নয়। কংগ্রেস নেতা কপিল সিব্বল নিজেই দিল্লিতে ১৩.৫৮ লক্ষ অবৈধ ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্তকে একটি নিয়মিত প্রশাসনিক কাজ বলে সমর্থন করেছিলেন। শেষবার নিবিড় সংশোধনের পর প্রায় ২০ বছর কেটে গিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে ভোটার তালিকা নির্ভুল করার কাজ না-হওয়াকে গণতন্ত্র রক্ষার কাজ বলা যায় না; বরং এর ফলে দুর্নীতিগ্রস্ত ভোটার তালিকাকেই রক্ষা করা হচ্ছে।

এখনই SIR কেন?

গত ২০ বছরে ভারতে বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে, মানুষ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলে গিয়েছেন এবং অবৈধ অনুপ্রবেশের ঘটনাও ঘটেছে। অথচ ভোটার তালিকায় মৃত ব্যক্তিদের নাম রয়ে যাচ্ছে কি না, তা নিশ্চিত করাই SIR-এর অন্যতম উদ্দেশ্য। প্রশ্ন হল, এতে কংগ্রেসের এত আপত্তি কেন? তারা কি নির্বাচনে জিততে ফুলিয়ে- ফাঁপিয়ে তৈরি করা ভ্রান্তিপূর্ণ ভোটার তালিকার উপর নির্ভর করে? তৃণমূল কংগ্রেসের মতো দলগুলি ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি করতে গিয়ে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের দেশে প্রবেশের সুযোগ করে দিয়েছে এবং আধার, রেশন ও ভোটার পরিচয়পত্রের মতো নথি পেতে সাহায্য করেছে। নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ১৩ কোটি নাম বাদ দেওয়ার অভিযোগ তুলে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। অথচ তালিকার বিস্তারিত বিবরণে মৃত, স্থানান্তরিত কিংবা একাধিকবার নথিভুক্ত ব্যক্তিদের নামের মতো বিভিন্ন ধরনের এন্ট্রির কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

SIR-এর বৈধতা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ

সুপ্রিম কোর্ট SIR-কে বৈধ বলে ঘোষণা করেছে এবং ভোট চুরির বিষয়ে বিরোধীদের দাবিগুলি খারিজ করেছে। সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্টভাবে বলেছে যে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করার জন্য নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা আনুপাতিক, আইনসম্মত ও প্রয়োজনীয়। পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা ও ঝাড়খণ্ডে ৭০০-রও বেশি কর্মরত বিচার বিভাগীয় আধিকারিককে নিয়োগ করা হয়েছিল, যাতে ৬০ লক্ষেরও বেশি বিতর্কিত ভোটার-নিবন্ধনের বিষয় নিষ্পত্তি করা যায়। সুপ্রিম কোর্ট যখন এই প্রক্রিয়ার উপর ধারাবাহিকভাবে নজরদারি করেছে এবং সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে, তখন বিরোধীরা এই প্রক্রিয়ার বিরোধিতা করছে কেন?



SIR-এ ১৩ কোটি নাম বাদ পড়ার কারণ কী?

SIR প্রক্রিয়ায় মোট ১৩ কোটি নাম বাদ পড়ার কারণগুলির বিভাজন নিম্নরূপ:

সম্ভাব্য স্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত ভোটার

৪৮.১% — মোট ৬.৩ কোটি

সমীক্ষার সময় অনুপস্থিত

২২.৯% — মোট ৩.০ কোটি

মৃত হিসেবে তালিকাভুক্ত

২১.৪% — মোট ২.৮ কোটি

ডুপ্লিকেট নিবন্ধন

৭.৬% — মোট ১.০ কোটি

ভোটাররাই নির্বাচনের ফল নির্ধারণ করেন, SIR নয়ঃ

কংগ্রেস নির্বাচনে হেরে যাওয়ার পরও নির্বাচন হারার জন্য অভিযোগ করে চলেছে। ২০১৪ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে ৫৬টি রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস পরাজিত হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই SIR-এর আগে দলটি পরাজিত হয়েছিল। বর্তমানে কেরলে কংগ্রেস শাসক দল রূপে রয়েছে। এই নির্বাচন SIR-এর পর অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাহলে কংগ্রেস যখন নির্বাচনে জয়ী হয়, তখন SIR-কে মেনে নেয়। আর যখন নির্বাচনে পরাজিত হয়, তখন SIR-কে 'ভোট চুরি' বলে আখ্যা দেয়।

২০১৪ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে কংগ্রেস ৫৬টি বিধানসভা নির্বাচনে হেরেছে — বর্তমান এসআইআর-এর আগেই।

এই রাজ্যগুলিতে কংগ্রেসের সর্বশেষ মুখ্যমন্ত্রী এই বছরে পদে ছিলেন

- ১৯৬৭ — তামিলনাড়ু
- ১৯৭৭ — পশ্চিমবঙ্গ
- ১৯৮৯ — উত্তরপ্রদেশ
- ১৯৯০ — বিহার
- ১৯৯২ — ত্রিপুরা
- ১৯৯৫ — গুজরাট
- ২০০০ — ওড়িশা
- ২০০৩ — ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ, নাগাল্যান্ড
- ২০১২ — গোয়া
- ২০১৪ — অন্ধ্রপ্রদেশ, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র
- ২০১৬ — অরুণাচল প্রদেশ, অসম
- ২০১৭ — মণিপুর, উত্তরাখণ্ড
- ২০১৮ — মেঘালয়, মিজোরাম
- ২০২২ — পাঞ্জাব
- ২০২৩ — রাজস্থান

যেসব রাজ্যে কংগ্রেসের আর কোনও বিধায়ক নেই

- ঝাড়খণ্ড — ২০০০ সালে রাজ্য গঠনের পর থেকে কখনও মুখ্যমন্ত্রী হয়নি।
- সিকিম — ১৯৭৫ সালে রাজ্য হওয়ার পর থেকে কখনও মুখ্যমন্ত্রী হয়নি।

যে রাজ্যগুলিতে কংগ্রেস দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতার বাইরে

রাজ্য	সর্বশেষ নির্বাচিত কংগ্রেস মুখ্যমন্ত্রী	ক্ষমতার বাইরে থাকার বছর
তামিলনাড়ু	১৯৬৭	৫৯ বছর
পশ্চিমবঙ্গ	১৯৭৭	৪৯বছর
উত্তরপ্রদেশ	১৯৮৯	৩৭ বছর
বিহার	১৯৯০	৩৬ বছর
ত্রিপুরা	১৯৯৩	৩৩ বছর
গুজরাট	১৯৯৫	৩১ বছর
ওড়িশা	২০০০	২৬ বছর

বর্তমান এসআইআর-এর বহু দশক আগেই এই পতন শুরু হয়েছিল।

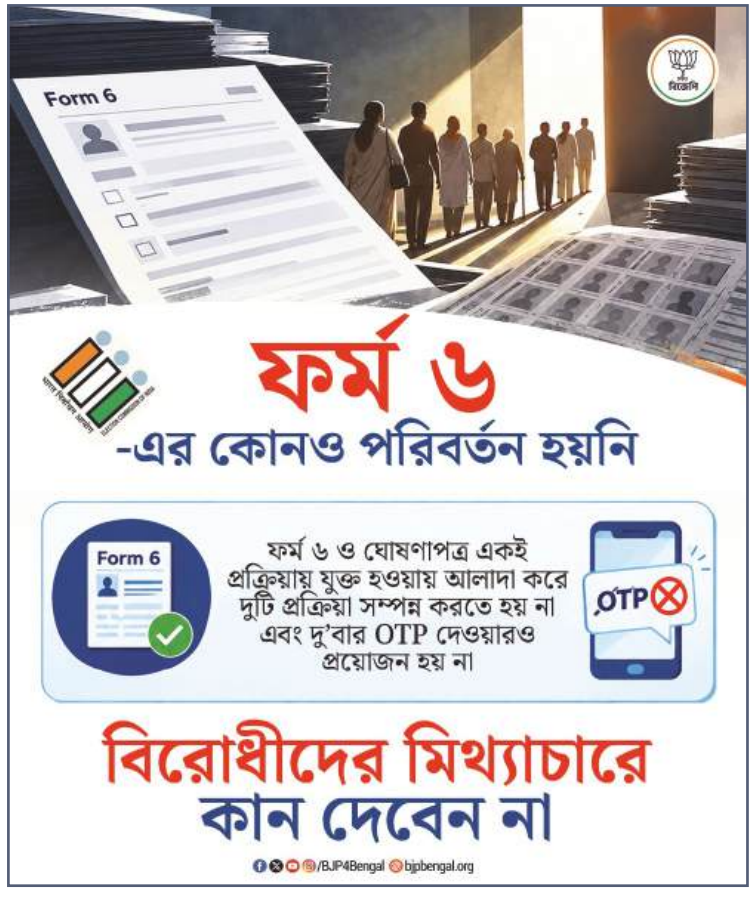
বিরোধী দলগুলির এসআইআর- বিরোধী প্রতিবাদ কি শাসনব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রচেষ্টা?

- বিদেশি অর্থে পরিচালিত এনজিও, ডিপ স্টেটের কার্যকলাপ এবং ভারতবিরোধী শক্তিগুলি বিদেশি স্বার্থের নির্দেশে ভারত বিরোধী বয়ান তৈরি করছে।
- নেপাল, শ্রীলঙ্কা ও বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাগুলি সতর্কবার্তা— বিদেশি অর্থপুষ্ট আন্দোলন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি মানুষের আস্থা নষ্ট করতে পারে।

- এফসিআরএ (সংশোধনী) বিল, ২০২৬-এর লক্ষ্য হল বিদেশি অর্থায়নের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা, যা অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির কাজে ব্যবহৃত হতে পারে।
- সিজেপি নেতা অভিজিৎ দীপকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক দাতাদের কাছ থেকে অর্থ পাওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত। অন্যদিকে, আশুতোষ রানকা পাকিস্তানি দাতাদের কাছ থেকে অর্থ পাওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত। অপারেশন সিঁদুর চলাকালীনও আশুতোষ রানকা তাঁর হ্যান্ডলার সানিয়া নিশতারের কাছ থেকে অর্থ পেয়ে থাকেন।

অরাজকতা উসকে দেওয়ার অভিযোগ

- আইসা নেত্রী নেহা বোরা প্রকাশ্যে বলেছেন যে, "বাংলাদেশ পথ দেখিয়েছে" — তিনি ভারতে বাংলাদেশ- ধাঁচের শাসনব্যবস্থা পরিবর্তনের আন্দোলনকে সমর্থন করেছেন।
- ধ্রুব রাঠি, যিনি ভারতেও থাকেন না, সেনাবাহিনী ও পুলিশকে নিজেদের সংগঠিত করে সম্মিলিতভাবে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন।



প্রথম কংগ্রেস ও তার সাঙ্গোপাঙ্গরা আমাদের সেনাবাহিনীকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। তারপর সংসদকে অচল করেছে। সংবাদমাধ্যম যখন তাদের প্রশ্ন করেছে, তখন তারা সংবাদমাধ্যমকে "গোদি মিডিয়া" বলে কটাক্ষ করেছে। তারা সুপ্রিম কোর্টের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়েছে, EVM-কে আক্রমণ করেছে এবং নির্বাচনের স্বচ্ছতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। এখন, জনগণের আস্থা অর্জনে ব্যর্থ হয়ে তারা নির্বাচন কমিশন, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এবং এমনকি ভোটার তালিকাকেও আক্রমণের লক্ষ্য করেছে। ভারতীয় গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে এটি খুবই চিন্তার বিষয়। সকল শুভবুদ্ধিসম্পন্ন, গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষকে এগিয়ে এসে অরাজকতার এই রাজনীতিকে পরাস্ত করতে হবে।




বিজেপি
কৃষকের সম্মান,
কৃষকের স্বনির্ভরতা
মোদীজির অঙ্গীকার
১৮,৬৯০
কোটি টাকার আর্থিক সহায়তা
৯.৩৪
কোটি+ কৃষক উপকৃত
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির উদ্যোগে
পিএম কিষান যোজনার ২৪তম কিস্তির
টাকা পেলেন কৃষকরা
/BJP4Bengal
bjpbengal.org



'তান্ডব' নয় গেরুয়াতেই ভরসা

প্রমাণ করল রেজিনগর-নন্দীগ্রাম

জয়ন্ত গুহ

যারা লিখেছিল 'গেরুয়া তান্ডব' তারা কি লজ্জা পেল? যারা ফতোয়া দিয়েছিল 'গেরুয়া তান্ডব' বলে তাঁদের কি আক্কেল দাঁত গজালো? বাম-কংগ্রেসের পালে হাওয়া টানতে, যাদবপুরকে সামনে রেখে যে 'দিমাগি নকশাল'রা ল্যাজ তুলে গেরুয়া তান্ডবের ন্যারেটিভ প্রচার করেছিল এবার তারা তাঁদের কাঁটা কান কোথায় রাখবেন? বাক্সে? সাবধান। চিল-এ যেন ছোঁ মেরে না নিয়ে যায়!

ফলতা-রেকর্ড ভেঙে নন্দীগ্রাম বিজয়! প্রায় ৭০ শতাংশ মুসলিম অধ্যুষিত রেজিনগরেও জিতল বিজেপি, ব্যবধান ৭৫ হাজার। অনেকটা এমনই ছিল উপনির্বাচনের ফলাফল বেরোনোর পর অধিকাংশ সংবাদ মাধ্যমের হেডলাইন। অনেকেই মানতে পারছেন না। মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে কিন্তু বাস্তব এটাই। আসলে রেজিনগর-নন্দীগ্রামে বিজেপি শুধু জেতেনি। একটা বিরাট বড় এক্সপেরিমেন্ট করে ফেলেছে। রেজিনগর-নন্দীগ্রামে মুসলিম সমাজের একটা বিরাট অংশের মানুষ বাম-কংগ্রেস থেকে সরে এসেছে বিজেপির দিকে। বিশেষ করে মুসলিম তরুণ সম্প্রদায়, মুসলিম মা-বোনেরা এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের একটা বিরাট অংশের মানুষ যারা বাম-তৃণমূল আমলে পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে ঘর-পরিবার ফেলে রাজ্যের বাইরে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল। একটা ছোট অংশের মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ, যাদের বয়স ৬০-৬৫ তারাই একমাত্র এখনও আছে বাম-কংগ্রেসের সঙ্গে। রেজিনগর-নন্দীগ্রামের এক্সপেরিমেন্ট সফল। এবং এই ট্রেন্ড এখানেই থেমে থাকবে না। এটাই বহাল থাকবে পৌরসভা, বিধানসভা ও লোকসভায়।

মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ বিজেপিকে শুধু ভরসা করেনি। ভরসার ডালি যে উপুড় করে দিয়েছে তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ-রেজিনগরে ১০৯ নম্বর বুথে মোট ভোটারের সংখ্যা ছিল ১১০৯। উপ নির্বাচনের দিন ভোট পড়েছিল ৯৭২টি। ৯৭২টি ভোটের মধ্যে বিজেপি প্রার্থী শাখারভ সরকার পেয়েছেন ৯০৯টি ভোট। ওই বুথে বিজেপি প্রার্থীর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী হুমায়ূনের দলের প্রার্থী পেয়েছিলেন মাত্র ১টি ভোট। প্রাপ্ত ভোটের শতাংশের হিসেবে প্রায় ৯৪% ভোট পেয়েছেন বিজেপি প্রার্থী। ক্যামাক স্ট্রিটের 'খোকাবাবু' অবশ্য

সমাজমাধ্যমে হইচই ফেলে দিয়েছিল ১০৯ নম্বর বুথের ফলাফল নিয়ে। অভিযোগ ছিল, ওই বুথে 'মোট ভোটার সংখ্যা ৭৭২' হওয়া সত্ত্বেও বিজেপি প্রার্থী ৯০৯টি ভোট পেয়েছেন। চ্যানেলে চ্যানেলে তখন 'খোকাবাবু'র অভিযোগ। এরপর নির্বাচন কমিশন ও মুর্শিদাবাদের জেলা শাসক আসল পরিসংখ্যান প্রকাশ করতে ভুল স্বীকার করে নেয় চ্যানেল। নেতিয়ে পড়ে 'খোকাবাবু'। বেচারা! লালজুতো পায়, খোকাবাবু যায়- সেদিনের সেই সোনাঝরা সন্ধ্যার স্মৃতি আজ ঝুল-কালিতে মলিন।



যথারীতি ফলাফল প্রকাশ হতেই ভোট লুঠের দাবী বিরোধীদের। বিরোধী মানে ওই আর কি। সন্ধ্যায় চ্যানেলে চ্যানেলে হালুম হুলুম। ভোটের ময়দানে নামলেই দুম ফটাস। রেজিনগরে বামেরা পঞ্চম স্থানে। মমতার তৃণমূলেরও পিছনে সিপিআইএম। নন্দীগ্রামে টেনেটুনে তৃতীয় নম্বরে সিপিআই। কংগ্রেস দ্বিতীয় স্থানে। নন্দীগ্রামে প্রায় ৩০ শতাংশ মুসলিম ভোট। রেজিনগরে ৩ নম্বরে মমতার দল। এই বিরোধী নিয়ে কি আর বলা যায়! খেলা শুরুর আগেই তো গোল করে দিয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। কোনও রাখঢাক না করে উপনির্বাচনের প্রচারে নন্দীগ্রাম এবং রেজিনগরের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে তিনি বন্ধুত্বের বার্তা দিয়ে বলেছিলেন, আপনাদের সামনে সুযোগ এসেছে, সিদ্ধান্ত নেওয়ার, আপনারা কী সরকারের সঙ্গে থাকতে চান নাকি চান না!" স্বাভাবিকভাবেই শুভেন্দুবাবুর বাড়িয়ে দেওয়া বন্ধুত্বের হাত ধরেছে মুসলিম-অধ্যুষিত রেজিনগর। হাত ধরেছে নন্দীগ্রামের মুসলিম ভোটের একটা বিরাট অংশ।

নন্দীগ্রামের মুসলিম ভোট কখনোই বিজেপির পক্ষে ছিলনা। ভোট তো দূরের কথা, মুসলিম এলাকায় প্রার্থীও দিতে পারত না বিজেপি। ওদের মাথায় ছিল, বিজেপি এলেই নাকি ওদের দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে। এবার সেই মিথ্যাও ভেঙ্গে চুরমার। নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে নন্দীগ্রামের হরিপুরে দলীয় কার্যালয়ে শুভেন্দু অধিকারী মন্তব্য করেছিলেন, "আমরা পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রার্থী দিতাম না। নির্দল প্রার্থীদের সমর্থন করতাম। এখন তাঁরাই ডেকেছেন। ওঁদের কথা রাখতে গিয়েছিলাম। বহু মানুষ রাস্তায় বেরিয়েছেন। প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে রাস্তার দু'ধারে দাঁড়িয়ে ছিলেন দীর্ঘক্ষণ। প্ল্যাকার্ডে লেখা, 'আমরা বন্ধুত্ব করতে চাই'। ভাল! বন্ধুত্বের জন্য হাত বাড়ালে সেই হাতকে তো প্রত্যাখ্যান করা যায় না। ধরতে হয়।" হ্যাঁ ধরতে হবে তো! তাঁরাও তো ভারতের নাগরিক। কেউ যদি দেশবিরোধী না হয়, জিহাদি না হয় তার সঙ্গে বিজেপির কোনও বিরোধিতা নেই। এটাই এবার বুঝতে শুরু করেছে এ রাজ্যের মুসলিম সমাজ। শুভেন্দুবাবু তো পরিষ্কার বলেছেন, "নন্দীগ্রামের ৭০ হাজার ৩০০ এবং রেজিনগরের প্রায় ৭০ হাজার অন্নপূর্ণা যোজনা প্রাপক মহিলারা সপরিবার হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে বিজেপি-কে ভোট দিয়েছেন। এত বড় জয় কখনওই হত না, যদি রেজিনগরের ৩৫ হাজার সংখ্যালঘু মুসলিম অন্নপূর্ণাপ্রাপক দিদি-বোনেরা পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের ভোট না দিতেন।"

শুধু নন্দীগ্রাম নয়, রেজিনগরেও মানুষের মনে শুভেন্দুবাবু ভরসা যোগাতে পেরেছেন নির্বাচনী প্রচারে। যেটা রাজনীতিতে খুব জরুরী। এই ভরসাটুকুই তো মানুষ চায় একজন রাজনৈতিক নেতার কাছে, একজন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এবং একটি রাজনৈতিক দলের কাছে। হুমায়ুন কবীরের নাম না করে নির্বাচনী প্রচারে রেজিনগরে শুভেন্দুবাবু বলেছিলেন, "এখানে যিনি জনপ্রতিনিধি হয়েছিলেন, দুটো আসনে জিতে রেজিনগরটা ছেড়েছেন। কাকে চান আপনারা? যিনি হিন্দু-মুসলিম করবেন, মন্দির-মসজিদ করবেন? নাকি উন্নয়ন চান? পেটে ভাত, হাতে কাজ। বিজেপির আমলে আপনারা, হিন্দু, মুসলমান সবাই ভালো আছেন তো? ওরা তো বলেছিল, বিজেপি মুসলিমদের তাড়িয়ে ছাড়বে। কী দেখছেন এখন? আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি, আপনারা বিজেপিকে জেতান। দু'হাত ভরে আপনারা যা চাইবেন, তাই দেব।" শুভেন্দুবাবুর এই কথা ম্যাজিকের মত কাজে দিয়েছে রেজিনগরে। তারা বুঝিয়ে দিয়েছে, ধর্মের নামে উসকানি-স্বজনপোষন-জমিদারি হাবভাব তারা চাননা। তারা বেছে নিয়েছে রাজ্যে ডাবল ইঞ্জিন সরকারের উন্নয়নের জয়যাত্রা।

উপনির্বাচনের দুই বিধায়কের শপথ পাঠ সম্পন্ন। ২০৭ থেকে বর্তমানে বিধানসভায় বিজেপির আসন সংখ্যা দাঁড়াল ২০৯-তে। দুই বিধায়ককে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুভেন্দু অধিকারীর ইঙ্গিতপূর্ণ দাবী, ৬ মাসে যা দেখছেন, তা চা-বিস্কুটের সমান। এখনও বাকী আছে ব্রেকফাস্ট লাঞ্চ।

নতুন দুই বিধায়কের শপথ বাক্য পাঠ করানোর দিনে শুভেন্দুবাবু আবারও প্রত্যয়ের সঙ্গে বলেছেন "অনেকেই বিজেপিকে সাম্প্রদায়িক পার্টি বলে রাজনীতি করে খেয়েছেন। তাঁদের উদ্দেশে বলছি, রেজিনগরে ৭০ হাজার মহিলা অন্নপূর্ণা যোজনায় উপকৃত, তাদের মধ্যে ৩৫ হাজার মহিলাই সংখ্যালঘু পরিবারের সদস্য। আমরা হিন্দু, সনাতনী, কপালে টিকা ধারণ করি। কিন্তু সরকার চালানোর ক্ষেত্রে প্রয়োজনকে প্রাধান্য দেয় বিজেপি। রেজিনগরে ৩০০-এর মধ্যে ২০০ টি সংখ্যালঘু অধ্যুষিত বুথ। সেই রেজিনগরে ৭৫ হাজার মার্জিনে বিজেপি প্রার্থী শাখারভ সরকারের জয়।" মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, "৬ মাসের মধ্যেই সরকার মানুষের বিশ্বাস অর্জন করে এগোচ্ছে সেটা স্পষ্ট। এই ৬ মাসে যা দেখছেন, তা চা-বিস্কুটের সমান। এখনও ব্রেকফাস্ট লাঞ্চ বাকি। দেখতে থাকুন কীভাবে উন্নয়ন হয়।"

ছবিতে খবর





কলকাতা ও হাওড়া পৌরসভা নির্বাচন নিয়ে সল্টলেক বিজেপি কার্যালয়ে বিশেষ বৈঠকে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃত্ব।



নয়াদিল্লিতে বিমসটেক বৈঠক উপলক্ষে নৈশভোজে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহের সঙ্গে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারী।



ভারত সরকারের উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রকের বিশেষ পর্যালোচনা বৈঠকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী সুকান্ত মজুমদার।



বিজেপি বারাসত সাংগঠনিক জেলার কার্যকর্তাদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক বৈঠকে রাজ্য বিজেপি সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) শ্রী অমিতাভ চক্রবর্তী।



উপনির্বাচনে জয়ী দুই প্রার্থীর সঙ্গে বিজয় মিছিলে বিজেপি রাষ্ট্রীয় সাধারণ সম্পাদক শ্রী সুনীল বনসল ও রাজ্য নেতৃত্ব।



নিউটাউনের ডিবি ব্লক সর্বজনীন দুর্গাপূজায় বিজেপি রাষ্ট্রীয় সাধারণ সম্পাদক শ্রী সুনীল বনসল এবং রাজ্য বিজেপি সাধারণ সম্পাদিকা শ্রীমতী শশী অগ্নিহোত্রী।



মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারীর উপস্থিতিতে শুভসূচনা হল সাঁতরাগাছি-টাটানগর জয়পুর (খাতিপুরা) এক্সপ্রেসের।



ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলার নবনির্মিত জেলা বিজেপি কার্যালয়ের ভূমিপূজন অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার মহাশয়।



বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার বি-৬ চিলড্রেনস পার্ক সর্বজনীন শ্রীশ্রী দুর্গাপুজোয় বিজেপি সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) শ্রী অমিতাভ চক্রবর্তী।





দেশের প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে কংগ্রেসের কুরুচিকর মন্তব্যের বিরুদ্ধে ধর্মতলায় প্রতিবাদ মিছিলে রাজ্য বিজেপি সাধারণ সম্পাদিকা শশী অগ্নিহোত্রী সহ বিশিষ্ট রাজ্য ও জেলা নেতৃত্ব।

ছবিতে খবর





টালা বারোয়ারি সর্বজনীন শ্রীশ্রী দুর্গাপুজোয় রাজ্য সভাপতি শ্রী শমীক ভট্টাচার্য।



সপ্তমীর সকালে বালুরঘাট শহরে বস্ত্র প্রদান অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী সুকান্ত মজুমদার।



বিজয়া দশমির দিন সিঁদুর খেলার শুভ অবসরে রাজ্য বিজেপি সাধারণ সম্পাদিকা শ্রীমতী লকেট চ্যাটার্জি।



শ্রী শ্রী কোজাগরী লক্ষ্মী পূজার প্রসাদ বিতরণ করছেন রাজ্যের মন্ত্রী ডঃ কল্যাণ চক্রবর্তী।



হাওড়ার আমতা খালনায় কোজাগরী লক্ষ্মী পুজোর শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ।

ছবিতে খবর



গঙ্গার ভাঙন রোধে স্থায়ী সমাধান নিয়ে নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রকে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারী।



উত্তর দিনাজপুরের কর্ণজোড়ার তিস্তা ময়দানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিশেষ জনপরিষেবা প্রদান কর্মসূচিতে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারী।



বিজেপি বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার জেলা কার্যকর্তাদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক বৈঠকে রাজ্য সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) শ্রী অমিতাভ চক্রবর্তী।



আসানসোল বিজেপি জেলা কার্যালয়ের ভূমিপূজন অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গে দায়িত্বপ্রাপ্ত পর্যবেক্ষক শ্রী সুনীল বনসল, জেলা সভাপতি শ্রী দেবতনু ভট্টাচার্য সহ জেলা নেতৃত্ব।



হাওড়া গ্রামীণ সাংগঠনিক জেলায় নবনির্মিত কার্যালয়ের ভূমিপূজন অনুষ্ঠানে রাজ্য সভাপতি শ্রী শমীক ভট্টাচার্য, বিজেপি সাধারণ সম্পাদিকা শশী অগ্নিহোত্রী সহ রাজ্য-জেলা নেতৃত্ব।



দুর্গাপূজার পুণ্যতিথিতে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট শহরের বিজেপি মোড়ে ভারত কেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির নবনির্মিত মূর্তির উন্মোচন অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী সুকান্ত মজুমদার।

ছবিতে খবর



হুগলী সাংগঠনিক জেলার চুঁচুড়ায় নবনির্মিত কার্যালয়ের ভূমিপূজন অনুষ্ঠানে রাজ্য সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) শ্রী অমিতাভ চক্রবর্তী, বিজেপি বিধায়কগণ, রাজ্য নেতৃত্ব ও কর্মীবৃন্দ।



নিউটাউন ডিবি ব্লকের পূজায় বিজেপি রাষ্ট্রীয় সহ-সভাপতি ডাঃ মধুছন্দা কর এবং রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ শারদ্বত মুখোপাধ্যায়।



ঝাড়গ্রামে বিশেষ উপজাতি গোষ্ঠীর পরিবারগুলির পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে এক বিশেষ কর্মসূচির শুভ সূচনা করলেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারী।



সুন্দরবনের মানুষের সার্বিক উন্নয়ন এবং তাঁদের কাছে সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে বিশেষ জনপরিষেবা প্রদান কর্মসূচিতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারী।



ঐতিহ্যবাহী বাদামতলা আষাঢ় সংঘ-এর দুর্গাপূজার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী শ্রী স্বপন দাশগুপ্ত।



বলাগড় বিধানসভার বারো জিবি কলোনির দুর্গাপুজোর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে রাজ্য বিজেপি সাধারণ সম্পাদিকা শ্রীমতী লকেট চ্যাটার্জি।



কালীঘাট থানার সৌজন্যে বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠানে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং মাননীয় অর্থমন্ত্রী শ্রী স্বপন দাশগুপ্ত মহাশয়।



বার্নপুরের পুরানহাট সর্বজনীন দুর্গাপুজোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাজ্যের পুর ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী শ্রীমতী অগ্নিমিত্রা পাল।



মিনাখাঁ বিধানসভার মালঞ্চ মোহিতোষ রায় মেমোরিয়াল ক্লাবের শ্রী শ্রী দুর্গাপূজার অনুষ্ঠানে বিজেপি রাষ্ট্রীয় সহ-সভাপতি ডাঃ মধুছন্দা কর।



স্বাস্থ্যভবনে রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালের সহকারী সুপারিনটেনডেন্টদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ পর্যালোচনা বৈঠকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী ডাঃ শারদ্বত মুখোপাধ্যায়।





কলকাতা বিমানবন্দরে বিজেপি ট্রেড ইউনিয়ন সেলের বিশেষ অনুষ্ঠানে বিজেপি রাষ্ট্রীয় সাধারণ সম্পাদক শ্রী সুনীল বনসল, রাজ্য সভাপতি শ্রী শমীক ভট্টাচার্য, রাজ্য সাধারণ সম্পাদিকা শ্রীমতী শশী অগ্নিহোত্রী এবং সাংসদ শ্রী জ্যোতির্ময় মাহাতো।

ছেচল্লিশের নোয়াখালী

যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই

বিনয়ভূষণ দাশ

নোয়াখালী গণহত্যায় বজ্জাত গোলাম সরোয়ারের বাহিনীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন অসমসাহসী এক হিন্দু যোদ্ধা- রাজেন্দ্রলাল রায়চৌধুরী। প্রতিরোধহীন হিন্দু সমাজে এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম এই স্বাভিমানী, স্বধর্মনিষ্ঠ হিন্দু রাজেন্দ্রলাল রায়চৌধুরী। ৪৬-এর কলকাতার নায়ক যদি হন গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (গোপাল পাঁঠা), তাহলে ৪৬ এর নোয়াখালী হত্যাকাণ্ড প্রতিরোধের নায়ক অবশ্যই রাজেন্দ্রলাল রায়চৌধুরী।

১৯৪৬ এর "পার্টিশন রায়ট"-এর দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয় 'দি গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংস'-এর প্রায় ঠিক দুমাস পরেই। তৎকালীন বাংলার নোয়াখালীতে মুসলিম লীগের কুদৃষ্টি পড়ে। নোয়াখালী জেলায় মাত্রই কুড়ি শতাংশ হিন্দুর বাস; আশি শতাংশ মুসলিম সংখ্যাধিক্যের জেলা নোয়াখালী। অক্টোবর মাসের ১০ তারিখ, কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার দিন ওই অঞ্চলের হিন্দুরা যখন সম্পদ ও সৌভাগ্যের দেবী কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার আয়োজনে ব্যস্ত, সেই অবসরে মুসলিম লীগের পাণ্ডা, শ্যামপুর দিয়াড়া শরীফের খাদিম পীর গোলাম সারোয়ার হুসেইনী মেতে উঠল এক বীভৎস হিন্দুনিধনের খেলায়। এই গোলাম সারোয়ার সম্পর্কে ঐতিহাসিক ডঃ তপন রায়চৌধুরী তাঁর 'বাঙ্গালনামা'য় মন্তব্য করেছেন, "একটি বজ্জাত ধান্দাবাজের সুপরিকল্পিত বদমাইসির পরিণাম (এই দাঙ্গা)। প্রাণীটির নাম গোলাম সারোয়ার"। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বিশেষভাবে বলা দরকার। সাধারণভাবে হিন্দুদের মধ্যে একটি ভুল ধারণা প্রচলিত আছে যে, মুসলিম পীর, দরবেশ খুব নিরীহ প্রকৃতির একদল মুসলিম ধর্ম প্রচারক। তাঁরা সম্প্রীতির পূজারী। কিন্তু বাংলার ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায়, এঁরা অনেক সময়ই হিন্দুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সময় মুসলিম সুলতান বা নবাবদের সাহায্য করেছে, এমনকি নিজেরাও প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছে ; হিন্দুদের ব্যাপক ধর্মান্তর করেছে। গোলাম সারোয়ার দিয়াড়ার পীর, নুর কুতুব আলম গৌড়ের এক নামী দরবেশ। অথচ এঁরা সর্বদাই হিন্দুদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন এবং তাঁদের ধর্মান্তর করাতে সোৎসাহে অংশগ্রহণ করেছে।

যাইহোক, পূর্ববঙ্গের নোয়াখালী এবং ত্রিপুরা জেলার হিন্দুদের মধ্যে গোলাম সারোয়ারের ইশারায় ছড়িয়ে দেওয়া হল, বাংলাটা পাকিস্তান হচ্ছেই, সুতরাং একটা মালাউনের বাচ্চাও এ দেশে থাকবে না। সবাইকে বুকে বল্লম ঠেকিয়ে কলেমা উচ্চারণ করাতে হবে,


18/10/1946

যুগান্তর
JUGANTAR

নোয়াখালীতে পাঁচসহস্রাধিক নিহত ও অর্দ্ধলক্ষাধিক বিপন্ন

চাঁদপুর সহরের দিকে উন্মত্ত আক্রমণকারীদল

কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের বিমানযোগে উপস্থিত অঞ্চল পরিদর্শনের ব্যবস্থা

নোয়াখালীতে হত্যা ও অবাধ গুণ্ডামী

পলিটিক্যাল ডিপার্টমেণ্ট প্ররোচিত

পাকিস্তান মানে দারুল ইসলাম! সেখানে একটাও মুশরিক হিন্দু থাকবে না। হিন্দুর মেয়েদের সাদি করতে হবে কলেমা পড়ানোর পরে। আর যারা কলেমা পড়বে না তাঁদের কোতল করতে হবে। এই কাজ সম্পন্ন করার জন্য গোলাম সারোয়ারের নিজস্ব গুণ্ডাবাহিনী 'মিয়াঁর ফৌজ' নামে এক ফৌজ ছিল। গোলাম সারোয়ারের নেতৃত্বে মুসলিম লীগের নেতা-কর্মীরা প্রচার করল যে, শিখ সম্প্রদায় দিয়ারা শরিফ আক্রমণ করেছে। গোলাম সারোয়ার ওই অঞ্চলে নানা স্থানে

সভা ডেকে বিদ্বেষ ছড়াতে লাগলো। বলা হচ্ছিল-

১। ভাই ছাবেরা আম্নেরা যে চিয়ন চিয়ন চাইল হদাস করেন হেইগুন কে খায়—ইন্দুরা (হিন্দুরা)

২। ভাই ছাবেরা আম্নেরা যে মোডা মোডা সপুরি কেলা হদাস করেন হেইসব কে খায় – হিন্দুরা এবং

৩। হিন্দুদের শরিল তেইলতেইল্যা মোডাসোডা কিয়ের লাই—হেই তাঁরা বেবাক ভালা ভালা জিনিস খায় হিয়ার লাই।

এই ধরণের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষপ্রসূত কথায় মুসলিম সমাজকে উত্তেজিত করলে সম্প্রীতি থাকবে কিভাবে ? প্রতিবেশীকে তখন শত্রু ভাবাই স্বাভাবিক।

পূর্বপরিকল্পিত এই গুজবের ফলে আশপাশের এলাকার মুসলিমরা দলবদ্ধভাবে দিয়ারা শরিফে সমবেত হয়। গোলাম সারোয়ার হুসেইনী সমবেত মুসলিম জনতাকে রামগঞ্জ থানার আওতাধীন সাহাপুর বাজার আক্রমণ করতে নির্দেশ দেয়। কাশেম নামক আরেকজন লীগের পাণ্ডা তাঁর নিজস্ব বাহিনি, 'কাশেমের ফৌজ' নিয়ে ওই বাজারে পৌঁছায়। তাঁরা বাজারের হিন্দুদের দোকান লুট করতে শুরু করে। রাজেন্দ্রলাল রায়চৌধুরী এবং নলিনীরঞ্জন মিত্র গোলাম সারোয়ারের বহু কুকর্মের কথা প্রশাসনের নজরে এনেছিলেন। ফলে আগে থেকেই এঁরা গোলাম সারোয়ারের কুনজরে ছিলেন। খুব দ্রুত এই একতরফা হত্যাকাণ্ড ছড়িয়ে পড়ে নোয়াখালী জেলা এবং তৎকালীন ত্রিপুরা জেলার বিস্তীর্ণ


Amrita Bazar Patrika

OVER 5,000 BUTCHERED IN NOAKHALI AND TIPPERAH

UNPRECEDENTED LAWLESSNESS AND REIGN OF TERROR

WOMEN & CHILDREN HIDE IN JUNGLES

Police Refuse Help; Krijalani & Bose Rush To Scene

PREMIER PANT APPEALS FOR COMMUNAL HARMONY

Enthusiastic Reception At Allahabad

POLITICAL DEPT. ENGINEERED ANTI-NEHRU DEMONSTRATIONS

Frontier Police Attached: Unholy Alliance With League

অঞ্চলে। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাসমুহ হল রামগঞ্জ, বেগমগঞ্জ, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর, ছাগলনাইয়া প্রভৃতি নোয়াখালী জেলার থানা সমুহ এবং ত্রিপুরা জেলার হাজিগঞ্জ, ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর, লাকসাম, চৌদ্দগ্রাম ইত্যাদি থানা সমুহ। প্রায় এক সপ্তাহ ধরে চলে এই পৈচাশিক হত্যাকাণ্ড। প্রায় পাঁচ হাজারেরও বেশী হিন্দুকে হত্যা করা হয়, শয়ে শয়ে হিন্দু মহিলা ধর্ষিতা হন, এবং হাজারে হাজারে হিন্দু পুরুষ এবং মহিলাকে জোরজবরদস্তি মুসলিম ধর্মে ধর্মান্তরিত করা হয়। এই হত্যাকাণ্ডের বিশেষ দিক হল, জোরজবরদস্তি করে ব্যাপকহারে গণধর্মান্তর। নোয়াখালী জেলার একমাত্র হিন্দু প্রতিনিধি হারানচন্দ্র ঘোষচৌধুরী বাংলা বিধানসভায় এই হত্যাকে 'মুসলিম জনতার সঙ্ঘবদ্ধ রোষ' হিসেবে উল্লেখ করেন। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এই হত্যাকাণ্ডকে 'সংখ্যালঘু হিন্দু জনতার উপর সংখ্যাগুরু মুসলিমদের এক পরিকল্পিত এবং সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণ' বলে অভিহিত করেন। এই গণহত্যার অভিঘাতে মহাত্মা গান্ধীকেও নোয়াখালী এসে শিবির স্থাপন করে চারমাসের বেশী সময় অবস্থান করতে হয়েছিল। যদিও তাঁর এই শান্তি মিশন হিন্দুদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ হয়েছিল এবং হিন্দুদের নিজেদের গ্রামে স্থায়ী পুনর্বাসনে সাহায্য করতে পারেনি। শুধু তাই নয়, গান্ধীর এই মিশন ওখানকার মুসলিমদের রুষ্ট করে তুলেছিল। তাঁরা গান্ধীর এই শান্তি মিশন ভাল চোখে দেখেনি।

ইতোমধ্যে কংগ্রেস নেতৃত্ব দেশভাগ মেনে নেওয়ায় শান্তি মিশন এবং ত্রাণ শিবিরগুলি গুটিয়ে ফেলা হয়। আর জীবিত হিন্দুরা বিভক্ত ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা এবং আসামে দলে দলে চলে আসতে বাধ্য হয়। এই শিবিরগুলি থেকে পঞ্চাশ হাজারেরও বেশী হিন্দুকে অসমের গুয়াহাটি অঞ্চলে পুনর্বাসিত করা হয়। তবে সমস্ত অমানিশার মধ্যেই থাকে কিছু ক্ষীণ আলোর রেখা! নোয়াখালীর এই গণহত্যার মধ্যেও হিন্দু সমাজের মধ্যে এক ক্ষীণ আলোর রেখার মত দেখা দিয়েছিল কয়েকজন অসমসাহসী হিন্দু যোদ্ধা। তাঁদের মধ্যে একজনের কথা বিশেষভাবে বলব। তিনি রাজেন্দ্রলাল রায়চৌধুরী। মুসলিমরা করপাড়ায় নোয়াখালী বারের সভাপতি এবং হিন্দু মহাসভার নেতা রাজেন্দ্রলাল রায়চৌধুরী এবং সুরেন্দ্রনাথ বসুর বসতবাড়ি আক্রমণ করে। প্রথমে সুরেন্দ্রনাথ বসুর কথা সংক্ষেপে


SULEKHA

The Sunday Amrita Bazar Patrika

TRAGIC SITUATION IN NOAKHALI AND TIPPERAH

All Well-to-do Houses Burnt In Affected Areas

VICTIMS' WOEFUL TALES

Relief Impossible For Want Of Police Escort

BENGAL LEAGUE CONDEMNS NOAKHALI HOOLIGANISM

'Guarantee Security Of Minority'

WAY TO ERADICATE RIOTS

Azad Appeals To E. Bengal Muslims In Name Of Islam

Three Cases Of Stabbing

Over 70,000 Affected

NEHRU'S FIRST STAGE

বলে নিই। ওইদিন কাশেমের ফৌজ নারায়ণপুর থেকে সুরেন্দ্রনাথ বসুর 'জমিদারী অফিসের' দিকে এগিয়ে যায়। কল্যাণনগর থেকে আসা আরেকদল দাঙ্গাবাজ মুসলিম দল কাশেমের ফৌজের সাথে যোগ দেয়। এদের সাথে আরও অনেক ভাড়া করা মুসলিম গুণ্ডারা জমিদার অফিসে আক্রমণ করে। সামান্য প্রতিরোধের পরই সুরেন্দ্রনাথ বসু ধারাল অস্ত্রের আঘাতে মারাত্মক ভাবে আহত হন। মুসলিম জনতা হাত-পা বেধে তাকে জীবন্ত আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করে। এই আক্রমণে প্রায় চারশো হিন্দুকে হত্যা করা হয়েছিল। সুরেন্দ্রনাথ বসুকে মুসলিমরা আক্রমণ করেছে শুনতে পেয়ে পাশের পাঁচঘরিয়া গ্রামের ডাক্তার রাজকুমার পাল তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন। কিন্তু পথিমধ্যে তাকে মুসলিম দুর্বৃত্তরা ছুরিকাহত

করে। ১৪ অক্টোবরে রায়গঞ্জ বাজার সংলগ্ন গ্রামগুলোতে অগ্নিকাণ্ড দেখতে পেয়ে প্রায় দুইশত নরনারী স্থানীয় থানায় আশ্রয় নেয়। সংগঠিত মুসলিম জনতা এসময় রায়পুরের সকল দেবদেবীর বিগ্রহ ভেঙ্গে ফেলে, মন্দিরগুলো ধ্বংস করে এবং হিন্দু দোকান-বাড়িঘর লুট করে থানায় প্রবেশ করে। থানার মুসলিম দারোগা সব হিন্দু পুরুষকে থানা থেকে জোর করে বের করে দেয়। উন্মত্ত মুসলিম জনতা এসময় তাদেরকে তীব্রভাবে প্রহার করে স্থানীয় বড় মসজিদে নিয়ে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করে এবং গো-মাংস খেতে বাধ্য করে। স্থানীয় খ্যাতনামা ব্যবসায়ী নবদ্বীপচন্দ্র নাথ থানা থেকে বের হতে শেষ পর্যন্ত অস্বীকৃতি জানালে, মুসলিমরা তাকে থানার ভিতর থেকে টেনে হিঁচড়ে বের করে নিয়ে যায়। তাকে সেখানেই প্রকাশ্যে নৃশংস ভাবে প্রহার ও ছুরিকাঘাত করে হত্যা করে।

অক্টোবর মাসের ১১ তারিখে গোলাম সরোয়ারের ব্যক্তিগত বাহিনী 'মিঞার ফৌজ' নোয়াখালী বার এ্যাসোসিয়েশন ও জেলা হিন্দু মহাসভার সভাপতি রাজেন্দ্রলাল রায়চৌধুরীর বসতবাড়িতে আক্রমণ করে। দিনটি বাংলার চব্বিশে আশ্বিন, শুক্রবার, তেরোশো তিপান্ন সন। রাজেন্দ্রলাল রায়চৌধুরী মুর্শিদকুলী খাঁর আমলের এক রাজস্ব আদায়কারী বরাহীপ্রসাদের বংশধর। বরাহীপ্রসাদ তৎকালে বহুলা নামের ওই অঞ্চলের রাজস্ব সংগ্রাহক ছিলেন। এই পরিবার ছিল ওই অঞ্চলের দীর্ঘদিনের এক সম্মানিত পরিবার। যাইহোক, ওই দাঙ্গার দিন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামী ব্রম্ভকানন্দ তার বাড়িতে অতিথি হিসেবে ছিলেন। রাজেন্দ্রলালের বাড়ি পাকা, সুরক্ষিত। ফলে ওই অঞ্চলের কয়েকশো হিন্দু তাঁর বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সবার আতঙ্কিত, উদ্বিগ্ন মুখ। সবাইকে তিনি জানিয়ে দিলেন, তিনি জাত খোয়াবেন না, শেষ পর্যন্ত লড়াই করবেন। এই অবস্থায় যারা ঝুঁকি নিয়ে থাকতে চান থাকুন। সবাই থেকে যান সেখানে। বেলা দশটা নাগাদ জনা পঞ্চাশেক মারমুখী, ক্ষিপ্ত মুসলিম জনতা 'আল্লাহু আকবর', লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান, মারকে লেঙ্গে পাকিস্তান ধ্বনি দিতে দিতে জনৈক মঞ্জুরের নেতৃত্বে রাজেন্দ্রলালের বাড়িতে আক্রমণ করল। রাজেন্দ্রলাল পুরোটা দিন তার বাড়ির ছাদ থেকে তাঁর ব্যক্তিগত রাইফেল নিয়ে আক্রমণ প্রতিহত করেন। এই পাল্টা প্রতিরোধে দাঙ্গাবাজদের মধ্যে বেশ কয়েকজন নিহত হয়। দাঙ্গাবাজরা বুঝে যায়, এই অল্প কয়েকজনে হবে না। তাঁরা মৃতদেহগুলি তুলে নিয়ে ফিরে যায়। কিন্তু রাজেন্দ্রলালবাবু নিশ্চিত বুঝে যান, দাঙ্গাবাজরা আবার ফিরে আসবেই। তাঁর সাথে এই প্রতিরোধে সামিল হন এক অবসরপ্রাপ্ত সামরিক অফিসার, ক্যাপ্টেন গোপীমোহন রাউত। তাঁরা দুজনে বাড়ির সিমেন্টের গেটের দুপাশে অবস্থান নিয়েছিলেন; সঙ্গে রাজেন্দ্রলালের এক পুত্রও ছিল। রাত নেমে আসার পর দাঙ্গাবাজেরা ফিরে যায়। তখন রাজেন্দ্রলাল স্বামী ব্রম্ভকানন্দ এবং তার পরিবারের সদস্যদের নিরাপদ স্থানে পাঠিয়ে দেন। পরের দিন আবার মুসলিম দাঙ্গাকারীরা সংগঠিত হয়ে রাজেন্দ্রলালের বাড়িতে আক্রমণ করে। সারোয়ারের ফৌজ চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে রায়চৌধুরী বাড়ি। ওদিকে হিংস্র জনতার মুখে তখন শ্লোগান, কলকাতার বদলা চাই, রাজেন উকিলের মুণ্ডু চাই ইত্যাদি। কিন্তু তাঁরা বন্দুকের নাগালের মধ্যে আসতেই রাজেন্দ্রলাল ও তাঁর দুই সঙ্গী অব্যর্থ লক্ষ্যে বন্দুক চালাতে লাগলেন। ফলে একের পর এক 'মিয়াঁর ফৌজের' ফৌজি নিহত হতে থাকল। অবশ্য তাতে ওঁদের ভ্রূক্ষেপ নেই, একজন নিহত হলে অন্য কেউ তাঁর স্থান নিল। এদিকে বন্দুকের গুলিও একসময় ফুরিয়ে গেল। ইতিমধ্যে 'মিয়াঁর ফৌজের' সাইত্রিশ জনের মৃত্যু হয়েছে, আহত হয়েছে জনা চল্লিশেক। মিয়াঁর ফৌজের পাণ্ডারা বুঝতে পারল, অল্প কজনে হবে না। তাঁরা পশ্চাদবসরণ করে। কিন্তু দুপুরে তাঁরা সশস্ত্র হয়ে আরও অধিক সংখ্যায় দলবদ্ধ হয়ে ফিরে আসে। তারা রাজেন্দ্রলালের বাড়ি চারদিক থেকে ঘিরে সামনে কাঠ, খড়, বাঁশ, বাড়ির দরজা-জানালা ভেঙে যা পেল তাই দিয়ে কেরোসিন ও পেট্রোল সহযোগে অগ্নি সংযোগ করল। এরপর একে একে রাজেন্দ্রলাল, তার অগ্রজ চিন্তাহরণ এবং অনুজ সতীশসহ পরিবারের ২৬ জন সদস্যকে হত্যা করা হয়। এই পরিবারের সদস্য, ঐতিহাসিক ডঃ মাখনলাল রায়চৌধুরী তখন কলকাতায় থাকায় রক্ষা পান। পরবর্তীকালে তিনি ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আহ্বানে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গঠনে বিশেষ ভুমিকা নেন।

রাজেন্দ্রলাল রায় চৌধুরীর শরীর থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন করে ফেলে মুসলিম গুণ্ডারা। সেই ছিন্ন মস্তক একটি রূপোর থালায় করে গোলাম সরোয়ার হুসেনির নিকট উপহার হিসেবে নিয়ে আসে তার বাহিনী।

কংগ্রেস নেত্রী সুচেতা কৃপালনির (মজুমদার) মতে, রাজেন্দ্রলাল শিবাজি এবং গুরুগোবিন্দের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন এবং তার পরিবারের সম্মান ও নিজের বিশ্বাসকে রক্ষা করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেন। গান্ধিবাদী অহিংস আন্দোলনের একনিষ্ঠ অনুসারী আচার্য জেবি কৃপালনী মনে করেন, রাজেন্দ্রলাল আর তার পরিবার নিজেদের রক্ষা করতে সম্পূর্ণ অহিংস পন্থা বেছে নিয়েছিলেন। ঐতিহাসিক রাকেশ বটব্যালের বক্তব্য, এই গণহত্যায় ব্যাপক পেট্রোল এবং কেরোসিনের ব্যবহার প্রমাণ করে যে এই গণহত্যা পূর্বপরিকল্পিত এবং সঙ্ঘবদ্ধ প্রকৃতির। এমএ খানের ভাষ্য অনুযায়ী, নোয়াখালীর ৯৫% হিন্দু অস্ত্রের মুখে মুসলিম ধর্মে ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য হয়েছিল। বিচারপতি জিডি খোসলাও একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ঘটনার তিন মাস পরে নোয়াখালী পরিদর্শনের সময় মহাত্মা গান্ধী লুটপাট আর ধ্বংসকৃত রাজেন্দ্রলালের বাড়িতে যান। ১৯৪৭ সালের ১১ জানুয়ারি রাজেন্দ্রলালের গলিত শব আজিমপুরের জলা থেকে তুলে লামচর হাই স্কুলে গান্ধীজীর প্রার্থনা সভাতে নিয়ে আসা হয়। প্রার্থনার পরে রাজেন্দ্রলালের মস্তক বিহীন শরীর হিন্দু রীতিতে দাহ করা হয়। প্রতিরোধহীন হিন্দু সমাজে এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম এই স্বাভিমানী, স্বধর্মনিষ্ঠ হিন্দু রাজেন্দ্রলাল রায়চৌধুরী। ৪৬-এর কলকাতার নায়ক যদি হন গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (গোপাল পাঁঠা), তাহলে ৪৬ এর নোয়াখালী হত্যাকাণ্ড প্রতিরোধের নায়ক অবশ্যই রাজেন্দ্রলাল রায়চৌধুরী।

বিজন সেতু গণহত্যা

লাল সন্ত্রাসের আলোকে অমীমাংসিত করুন প্রেক্ষাপট

রুবী সাঁই

এখনো পর্যন্ত লালা কমিশনের পেছনে খরচ হয়েছে ৩.২ কোটি টাকা, এই পর্যন্ত কমিশন ৬১ জনের সাক্ষ্য নিয়েছেন, বেশ কিছু সাক্ষী মারা গিয়েছে। লালা কমিশনের মেয়াদ ২০১৯ সালের পয়লা এপ্রিল পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। অর্থাৎ বিভিন্ন তদন্ত কমিশন গঠন সিআইডি তদন্ত এবং আইনি হস্তক্ষেপের পরও এই মর্মান্তিক গণহত্যার আজ ৪০ বছরের বেশি সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরও প্রকৃত অপরাধীরা সাজা পাননি।

১৯৮২ সালের ৩০ এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গের মহানগরী কলকাতার বালিগঞ্জ সংলগ্ন বিজন সেতুর ওপর সংগঠিত হয়েছিল এক নৃশংস হত্যালীলা, যেখানে হিন্দু সংগঠন আনন্দমার্গের ১৬ জন সন্ন্যাসী ও ১ জন সন্ন্যাসিনীকে প্রকাশ্য দিবালোকে মবলিঞ্চিং বা গণপিটুনি সহকারে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের গৌরবান্বিত ইতিহাসে সুদীর্ঘ অতীতে এই গণহত্যা শুধুমাত্র কলঙ্কের ছাপ ফেলেনি, বরং নানাবিধ প্রশ্ন যেমন একদিকে তুলে ধরেছিল তেমনি রাজনৈতিক অভিসন্ধির এক নিগূঢ় সম্পর্ককেও প্রতিষ্ঠা করেছিল। কারণ তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের শাসন ব্যবস্থায় বাম মতাদর্শে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দল অর্থাৎ 'বামফ্রন্ট' সরকার ক্ষমতাসীন ছিল। এই নৃশংস গণহত্যার প্রকৃত আইনি সমাধান ও দোষীদের সনাক্ত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বামফ্রন্ট সরকার অসমর্থ হয়েছে। প্রশাসনিকভাবে বামফ্রন্ট সরকারের ব্যর্থতা রাজনৈতিক অভিসন্ধির সুপ্ত ইচ্ছাকে বাস্তবায়নের পেছনে সন্ত্রাসের সাহায্য নেওয়ার মতো দৃষ্টান্ত একদিকে যেমন ফুটে ওঠে, তেমনি অন্যদিকে আদর্শগতভাবে আনন্দমার্গ সংগঠনের বামপন্থা বিরোধী আদর্শকে প্রতিহত করার পূর্ব পরিকল্পনা রূপে এই নৃশংস ঘটনা গড়ে তোলার উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলা হয়েছে। পক্ষান্তরে বামপন্থী বুদ্ধিজীবীরা এই নৃশংস ঘটনাকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্য আনন্দমার্গ সংগঠনকে সন্ত্রাসবাদী আখ্যা দেওয়া থেকে শুরু করে মৃত সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের অপহরণকারী অপবাদে ভূষিত করে বিকল্প যৌক্তিক ব্যাখ্যা নির্মাণ করে জনসম্মুখে প্রচার করে।

মতাদর্শগতভাবে আনন্দমার্গ সংগঠনের সদস্যরা বামফ্রন্ট সরকারের বিরোধী ছিলেন। অন্যদিকে আনন্দমার্গ সংগঠন একটি



জনহিতকর সংগঠন হিসেবে বাংলার অসংখ্য মানুষকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছিল। সর্বোপরি এই নির্মম হত্যালীলা বামফ্রন্ট সরকারের শাসনের সময় সংঘটিত হয়েছিল, তাই এই ঘটনায় সরকারের কিছু গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্বের নাম জড়ানো এবং দোষীদের সাজা না হওয়ার পেছনে প্রশাসনিক শক্তিকে রাজনৈতিক লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা এবং নির্মম গণহত্যার পেছনে সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের শিশু অপহরণকারী অপবাদে ভূষিত করা এবং তার প্রচার করা কোথাও যেন এই নির্মম গণহত্যাকে পূর্বপরিকল্পিত ও মতাদর্শগত বিরোধের সম্পর্ককে স্থাপন করতে চায়।

আনন্দমার্গ সামাজিক ও আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ১৯৫৫ সালে ভারতের অঙ্গরাজ্য বিহারের জামালপুরে প্রভাত রঞ্জন সরকার তথা শ্রী শ্রী আনন্দ মূর্তি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। যে মার্গ বা পথ মানুষকে একঅনন্ত ব্রহ্মের দিকে অগ্রসর হতে প্রেরণা প্রদান করে, সেই পথই আনন্দমার্গ। দার্শনিক বিচারে আনন্দমার্গ বেদান্ত এবং সাধনাগত বিচারে যোগ দর্শনে বিশ্বাসী। আনন্দমার্গ মানুষের তৈরি সকল প্রকার ভেদাভেদের বিরোধী, গুরুবাদ, অবতারবাদ ও পুরোহিত তন্ত্রে আনন্দমার্গ বিশ্বাসী নয়। দেবতার নামে পৌত্তলিকতা এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে জাতিভেদ প্রথা আনন্দমার্গীদের মতে কুসংস্কার মাত্র। আনন্দমার্গের মূলনীতি হল সময় উপযোগী আত্মন্নতি ও জনসেবা, আত্মন্নতির জন্য সুবিন্যস্ত নৈতিক ওঅধ্যাত্মিক বিধি-বিধান অনুসরণ করা এবং জনসেবার জন্য মানুষের পাশে থাকা। শিক্ষা সম্পর্কে আনন্দমার্গের অভিমত হল, যে শিক্ষা মানুষকে শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক বন্ধন থেকে মুক্ত করে সেই শিক্ষাই হলো প্রকৃত শিক্ষা।তাই আনন্দমার্গের নিজস্ব শিক্ষা বিভাগের মাধ্যমে প্রাথমিক পর্যায় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন, সময়পোযোগী পাঠক্রম তৈরি এবং মনস্তত্ত্ব সম্মত পরীক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে আদর্শশিক্ষা প্রণালী প্রবর্তনের পক্ষপাতী। ভারতবর্ষ এবং ভারতবর্ষের বাইরে বহু সংখ্যক প্রাইমারি, হাই স্কুলও কলেজ মার্গের শিক্ষা ব্যবস্থা অনুযায়ী পরিচালিত হয়। মার্গের আদর্শ ও জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সমগ্র পৃথিবীতে নয়টি সেক্টর রয়েছে যেমন দিল্লি সেক্টর, হংকং সেক্টর, ম্যানিলা সেক্টর, নিউইয়র্ক সেক্টর, সিডনি সেক্টর, জর্জ টাউন সেক্টর, বার্লিন সেক্টর, কায়রো সেক্টর ও নাইরোবি সেক্টর। আনন্দমার্গের নিজস্ব ত্রাণ শাখা পৃথিবীর যেকোনো দেশে বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, গৃহযুদ্ধ ইত্যাদি প্রাকৃতিক ও মানুষ্য সৃষ্ট বিপর্যয়ে মার্গের কর্মীরা দুঃস্থ মানুষদের বিভিন্নভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করে থাকেন। মার্গের নিয়ন্ত্রণে অসংখ্য স্থায়ী অনাথ আশ্রম, মুক-বধির বিকলাঙ্গ আশ্রম, চিকিৎসালয় পরিচালিত হয়, যেখানে অসংখ্য অনাথ শিশু এবং দুস্থ মানুষেরা বিভিন্ন ধরনের সাহায্য ও সহযোগিতা পেয়ে থাকেন। আনন্দমার্গ সংগঠনটি পৃথিবীর ১৮০টির ও বেশি দেশে প্রতিষ্ঠিত এবং এই সংগঠনের মূল কথা হলো ‘‘আত্মমক্ষারথংজগদ্ধিতায় চ’’ অর্থাৎ আত্মার মোক্ষ: প্রাপ্তি ও জগতের কল্যাণ সাধন।

১৯৫৯ সালে আনন্দমার্গ সংগঠন তাদের বাম মতাদর্শ বিরোধী তত্ত্ব উপস্থাপন করে। আনন্দমার্গের এই তাত্ত্বিক মতাদর্শ কমিউনিজম ও পুজিবাদের বিরোধী এবং যার মূললক্ষ্য ছিল একেবারে সমাজের তৃণমূল স্তরে আর্থসামাজিক গণতন্ত্রকে প্রসারিত করা। মার্গের রাজনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনা করার জন্য 'Proutist Block of India' তৈরি হয়। আনন্দমার্গ সংগঠনের কার্যকলাপ একটি সংস্কার আন্দোলন হিসেবে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল, যেখানে সমাজের প্রতিটি মানুষের সামাজিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়ন এবং সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বহু মানুষকে সঙ্ঘবদ্ধ করতে তারা সক্ষম হয়েছিল। তাছাড়া আনন্দমার্গ সংগঠনের জনহিতকর কার্যকলাপ যেমন অনাথ ও গরিব শিশুদের স্কুল ও আবাসন, অল্প পয়সায় খাওয়ার ব্যবস্থা, বৃদ্ধাশ্রম এবং বিভিন্ন ধরনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে মানুষের পাশে থাকার এক নিরন্তর প্রচেষ্টা তারা চালিয়েছিল। হেলেন ক্রোভেট্ট (Helen Crovetto) অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে প্রকাশিত একটি গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত তাঁর প্রবন্ধ "Ananda Marga, Prout, and the Use of Force"-এ লিখেছেন, খুব সম্ভবত কমিউনিস্ট পার্টি মনে করেছিল আনন্দমার্গীদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক দর্শন তাদের ভোটব্যাঙ্কে ভাগ বসাতে পারে। হেলেন আরও বলেছেন, আনন্দমার্গীদের বিভিন্ন সামাজিক সেবামূলক কার্যকলাপের ফলে ছেলেধরার অভিযোগটি বহু মানুষের কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য হয়েছিল। আনন্দমার্গ তার সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জনহিতকর কার্যকলাপের জন্য বাংলার অসংখ্য বুদ্ধিজীবী ও সাধারণ মানুষকে আকর্ষিত করতে সক্ষম হয়েছিল। আনন্দমার্গ তার আধ্যাত্মিকতা ও নৈতিকতার সমন্বয়ে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে যে সামাজিক পরিবর্তন আনার চেষ্টা করছিল তা পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের একটি গতিশীল বিকল্প হিসেবে সমাজের তৃণমূল স্তরে আর্থসামাজিক গণতন্ত্রকে প্রসারিত করা, যার ফলে ভারতবর্ষের বামপন্থী মতাদর্শের সাথে তাদের বিরোধ শুরু হয়, যার দৃষ্টান্ত হিসেবে বিজন সেতু গণহত্যার পূর্বে আনন্দমার্গ সংগঠনের সদস্যরা বেশ কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনায় বামপন্থী ষড়যন্ত্রের শিকার হন এবং বেশ কতগুলি সদস্য প্রাণ হারায়।

পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর আনন্দমার্গ সংগঠনের সদস্যদের বিরুদ্ধে প্রথম আক্রমণটি সংঘটিত হয় ১৯৬৭ সালের ৫ মার্চ পুরুলিয়া জেলার আনন্দনগরে, যেখানে আনন্দমার্গ সংগঠনের প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ছিল। পুরুলিয়া জেলার আনন্দনগরে স্থানীয় বামফ্রন্ট নেতাকর্মীরা মার্গের সদস্যদের উপর চড়াও হয়, এবং পাঁচজন কর্মীকে গণপিটুনি সহকারে আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে মারে। এই ঘটনার দুইবছর পর ১৯৬৯ সালে আগস্ট মাসে আনন্দমার্গ সংগঠনের বহু সদস্য কোচবিহারে ধর্মীয় আধ্যাত্মিকতার একটি সভায় উপস্থিত হয়। এই ধর্মীয় সভায় আকস্মিক আক্রমণ নেমে আসে। যেখানে একজন মার্গের সদস্য মারা যান এবং বহু সদস্য আহত হয়। আনন্দমার্গ সংগঠনের বৃহৎ প্রধান কার্যালয়টি ১৯৮১ সালে

কলকাতার তিলজলায় গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়, নির্মাণ কাজ শুরু থেকে মোটামুটি শেষ হওয়া পর্যন্ত মার্গের বহু সদস্য কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য দ্বারা বারংবার আক্রান্ত হয়।

ইতিহাসবিদ নরসিংহ শীল 'The Quarterly Review of Historical Studies' জার্নালে প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধ "The Troubled World of the Ananda Marga: An Examination"-এ লিখছেন যে, এই গণহত্যার আগে বহুদিন ধরে আনন্দমার্গীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্তরে নেতিবাচক প্রচার চালান হয়েছিল। নরসিংহ শীল দেখাচ্ছেন যে, পাশ্চাত্যের জাদুবিদ্যা (witchcraft) চর্চা করা মহিলাদের যে চোখে দেখা হত ঠিক সেইভাবে এদেরকে ছেলে-ধরা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। আনন্দমার্গ সংগঠনের আধ্যাত্মিক ও জনহিতকর কার্যকলাপ একদিকে যেমন বাংলার অসংখ্য মানুষের দৃষ্টিআকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল, তেমনি অন্যদিকে আনন্দমার্গের কমিউনিস্ট ও পুঁজিবাদবিরোধী মতাদর্শ সমাজের তৃণমূল স্তরের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠাতার লড়াই বামফ্রন্ট সরকারের ক্ষমতা হারানোর দুশ্চিন্তা



কমিউনিস্ট পার্টির কিছু নেতা ও নেতৃত্বকে ১৯৮২ সালের ৩০ এপ্রিল বিজন সেতু গণহত্যা ঘটানোর পূর্বপরিকল্পনা ও উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলার অনুপ্রেরণা প্রদান করেছিল। ৩০ এপ্রিল ঘটনার পূর্ব প্রস্তুতি শুরু হয় কয়েক মাস আগে থেকে, ফেব্রুয়ারি মাসে কসবা ও তিলজলা এলাকায় স্থানীয় কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা তিলজলার পিকনিক গার্ডেনের আরতি হলে 'নাগরিক কনভেনশন' আয়োজন করে। এই কনভেনশনে কমিউনিস্ট পার্টির বিশিষ্ট নেতৃবর্গ অংশগ্রহণ করেন এবং আনন্দমার্গ সংগঠনও তার কার্যকলাপকে সমাজবিরোধী হিসেবে চিহ্নিত করে, কসবা ও তিলজলা এলাকার জনসাধারণকে আনন্দমার্গ সংগঠনের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। কমিউনিস্ট নেতৃত্ব বর্গের এই কনভেনশনের পরই আনন্দমার্গ সংগঠনের বিরুদ্ধে নানান অপপ্রচার শুরু হয় দেওয়াল লিখন, ছোট ছোট সভাও রাস্তার ধারে করা হয়, যেখানে মার্গ ও তার সদস্যদের শিশু অপহরণকারী এবং সমাজবিরোধী প্রতিপন্ন করার প্রচেষ্টা চালানো হয়। পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক প্রমোদ দাশগুপ্ত আনন্দমার্গ বিরোধী বই প্রকাশ করেন এবং সর্বত্র সেই বই বিতরণ করা হয়। ২৯ এপ্রিল কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সন্তোষপুর লোকাল কমিটির সেক্রেটারি স্বপন চক্রবর্তী সহ রামনাথ সিং, অর্জুন মুখোপাধ্যায়, গোপাল রায়, নির্মল হালদার সহ সিপিএমের বেশ কিছু কুখ্যাত কর্মীদের নিয়ে একটি মিটিং হয়। আর সেখানেই আনন্দমার্গ সংগঠনের সদস্যদের হত্যার নীল নকশা তৈরি হয়।

৩০ এপ্রিল ১৯৮২ সালে দেশজুড়ে আনন্দমার্গ সংগঠন একটি শিক্ষামূলক সম্মেলনের আয়োজন করেছিল তিলজলার প্রধান কার্যালয়ে। সেই দিন একদল মার্গের সদস্য তারা বিশেষত সকলেই প্রাথমিক স্কুল ও অনাথ আশ্রমের প্রধান শিক্ষক ছিলেন তারা মূলত তিলজলার প্রধান কার্যালয়ে শিক্ষামূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অংশগ্রহণ করতে যাত্রা শুরু করে। ৩০ এপ্রিল সকাল বেলা সদ্য ঘুম থেকে উঠেছে সাবেক কলকাতা, নিয়মমাফিক প্রাত্যহিক ঢঙ্গেই শুরু হয় সকাল, শুধু জানা ছিল না বিজন সেতু ও ব্যান্ডেল গেটে ওত পেতে বসে আছে হানাদার দল। ট্যাক্সি করে মার্গের সদস্যরা বিজন সেতুর শেষ প্রান্তে পৌঁছলে একদল মানুষ ট্যাক্সি ঘিরে ধরে, সদস্যদের টেনে হিচড়ে নামায় এবং হঠাৎ চিৎকার শুরু হয় ছেলে ধরা, তোমরা ছেলে ধরা। তারপর পরিকল্পনার অন্তিম পর্বে মার্গের সদস্যদের গণপিটুনি সহকারে আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে মারা হয় ১৬ জন সন্ন্যাসী ও ১ জন সন্ন্যাসিনীকে। সকাল সাতটা থেকে আটটা মাত্র এক ঘন্টার ব্যবধানে কলকাতা মহানগরের গৌরবান্বিত ইতিহাসে সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী হত্যার কলঙ্কের ছাপ লাগে। এই মর্মান্তিক পরিকল্পিত ঘটনার আইনি পদক্ষেপ শুরু হয়। গড়ে তোলা হয় তদন্ত কমিশন কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে এই ঘটনার প্রকৃত অপরাধীরা কেউই উপযুক্ত সাজা পাননি।

আনন্দমার্গের ১৬ জন সন্ন্যাসী ও ১ জন সন্ন্যাসিনীকে পরিকল্পিতভাবে আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে মারার অভিযোগে কমিউনিস্ট পার্টির বেশ কিছু নেতা ও নেতৃত্বের নাম জড়িয়ে যায় এবং তাদের বিরুদ্ধে আইনি প্রক্রিয়া শুরু হয়। পাশাপাশি এই ঘটনাকে কমিউনিস্ট দলের পক্ষ থেকে অস্বীকার করা হয় এবং শিশু অপহরণকারী সন্দেহে উত্তেজিত জনগণ এই ঘটনা ঘটিয়েছে এমন যুক্তি খাড়া করা হয় এবং জনসম্মুখে প্রচার করা হয়। জনস্বার্থে তাৎপর্যপূর্ণ এই ঘটনার তদন্তের জন্য রাজ্য সরকার ১৯৮২ সালের ১২ মে কলকাতা হাইকোর্টের জাস্টিস সমরেন্দ্র চন্দ্র দেবকে নিয়ে গঠিত

হয় এক সদস্যের তদন্ত কমিশন। এই তদন্ত কমিশনের Terms of Reference ছিল- ১৭ জন মানুষ নিহত ও আরো বেশ কিছু মানুষ আহত হওয়ার সময় প্রকৃত পরিস্থিতি কি রকম ছিল? আক্রমণ ও নিগ্রহের পেছনে প্রকৃত কারণ খুঁজে বের করা, ঘটনাস্থলে পুলিশের

ভূমিকা কেমন ছিল, ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনা এড়ানোর সুপারিশ। দেব কমিশনের রিপোর্ট জমা দেওয়ার সময় ১২ জানুয়ারি ১৯৮২ সাল অবধি বাড়ানো হয়, এবং পরে ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৮৩ অবধি, প্রকৃতপক্ষে দেব কমিশন রিপোর্ট জমা দিয়েছিল কিনা তার স্বপক্ষে কোন নথি পাওয়া যায়নি। ১৯৯৬ সালে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এই ঘটনার তদন্তে উদ্যোগী হলেও সরকারের অসহযোগিতায় খুব একটা সাফল্যলাভ করতে পারেনি। পশ্চিমবঙ্গের এক আইএস অফিসার শের সিং এই ঘটনার কিছু তথ্য প্রমাণ প্রকাশ করার প্রস্তাব দেন। এই হত্যাকাণ্ডের সময় তিনি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক ছিলেন। তিনি Central Administrative Tribunal কে দেওয়া দরখাস্ত (1994 এর নং 1108)-এ অভিযোগ জানান যে জমি বিবাদ কে কেন্দ্র করে সরকারের সাথে আপোস না করায় তাকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। তিনি আরও জানান যে Official Secret Act এর কারণে কোন যোগ্য কর্তৃপক্ষের কাছেই গোপন তথ্য প্রকাশ করতে পারতেন। ১৯৯৯ সালে আনন্দমার্গ প্রচারক সংঘ বিষয়টির একটি উচ্চস্তরীয় বিচারবিভাগীয় অনুসন্ধানের দাবি তোলে। উড়িষ্যার খ্রিস্টান মিশনারি গ্রাহাম স্টেইন্স এবং তার দুই শিশু পুত্রের হত্যাকাণ্ডের তদন্তের জন্য যখন কেন্দ্রীয় সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করে, তখন সংঘ তা অনুসরণ করে প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীকে একটি ৬৬ পাতার চিঠি লেখে। "কলকাতার প্রকাশ্য দিবালোকে ১৭ জন আনন্দমার্গ সংগঠনের সদস্যদের হত্যার তদন্ত করার জন্য একটি অনুরূপ দল গঠন করার আর্জি জানায়। চিঠিতে জানানো হয় এই শহর এর আগে কখনোই এইরূপ নির্মম সুপরিকল্পিত হত্যাকান্ড দেখেনি, যা চলাকালীন ঢিল ছোড়া দূরত্বে থানা থাকা সত্ত্বেও পুলিশ হস্তক্ষেপ করেনি"। বামফ্রন্ট সরকারের জুডিশিয়াল কমিশনগুলোর বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের কোনো প্রতিবেদন রাজ্য বিধানসভার সামনে উপস্থাপন করতে পারেনি। ২০১১ সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতা হারায় এবং তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় আসলে বিজন সেতু গণহত্যার প্রকৃত গুরুত্ব অনুধাবন করে বিচার বিভাগীয়তদন্তের জন্য ২০১২ সালের ১৪ মার্চ জাস্টিস সন্তোষ কুমার ফৌজদারকে নিয়ে তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়, তিন মাসের মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়। পরে মেয়াদকাল ছয় মাস বাড়ানো হলেও এই কমিটির অনুসন্ধান ও তার রিপোর্ট সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। পরবর্তী সময়ে ২০১৩ সালে ৯ এপ্রিল এলাহাবাদ হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি জাস্টিস অমিতাভ লালাকে নিয়ে এক সদস্যের তদন্ত কমিশন গঠিত হয় জাস্টিস ফৌজদারের পরিবর্তে। রিপোর্ট জমা দেওয়ার মেয়াদ ২ মে ২০১৩ থেকে আরও ছয় মাস বাড়িয়ে দেওয়া হয়। ২০১৫ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর আরো ১ বছরের জন্য লালা কমিশনের মেয়াদ বাড়ানো হয়। কান্তি গাঙ্গুলী হাইকোর্টে তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে রিট পিটিশন দাখিল করে (কান্তি গাঙ্গুলী বনাম রাজ্য সরকার ও অন্যান্য রিট পিটিশন নং 9909)। যাতে মূলত তিনটি বক্তব্য তুলে ধরা হয়-এই ধরনের ঘটনার একবার কমিশন গঠন করা হলে সেটিকে অবৈধ ঘোষণা না করা পর্যন্ত দ্বিতীয় কোন কমিশন গঠন করা যায় না, এক্ষেত্রে বামফ্রন্ট সরকারের সময় গড়ে তোলা অমল দেব কমিশনকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়নি, সিআইডি নিম্ন আদালতের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে উচ্চ আদালতে আপিল করেনি, আপিল করা হয়নি আনন্দমার্গ সংগঠনের পক্ষ থেকেও। এই অবস্থায় নতুন তদন্ত কমিশন ডেকে তাদের মক্কেলকে সিআইডি ওআনন্দমার্গীদের পক্ষ থেকে জেরা করার কোন আইনি অধিকার নেই বলে দাবি করেন কান্তিবাবুর আইনজীবী। তাদের অভিযোগ কান্তিবাবু নতুন কমিশনে যান কিন্তু কমিশনের চেয়ারম্যানের বদলে তাকে জেরা করেন সিআইডি ও আনন্দমার্গের আইনজীবীরা। এটা আইন বিরুদ্ধ। এই রিট পিটিশনের বিচার শেষে জাস্টিস দীপঙ্কর দত্তের রায়ে জানানো হয় যে বিজন সেতু

হত্যাকাণ্ডের তদন্তে গঠিত অমিতাভ লালা কমিশন বৈধ। ফলে তদন্তের স্বার্থে সিপিএম নেতা কান্তি গাঙ্গুলীকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে কমিশন, তবে উত্তর দেওয়া বা না দেওয়ার স্বাধীনতা থাকছে কান্তিবাবুর। এখনো পর্যন্ত লালা কমিশনের পেছনে খরচ হয়েছে ৩.২ কোটি টাকা, এই পর্যন্ত কমিশন ৬১ জনের সাক্ষ্য নিয়েছেন, বেশ কিছু সাক্ষী মারা গিয়েছে। লালা কমিশনের মেয়াদ ২০১৯ সালের পয়লা এপ্রিল পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। অর্থাৎ বিভিন্ন তদন্ত কমিশন গঠন সিআইডি তদন্ত এবং আইনি হস্তক্ষেপের পরও এই মর্মান্তিক গণহত্যার আজ ৪০ বছরের বেশি সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরও প্রকৃত অপরাধীরা সাজা পাননি। প্রতিবছর ৩০ এপ্রিলকে নিহত সদস্যদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে আনন্দমার্গসংগঠন শোভাযাত্রা ও মিছিল বের করেন।

তথ্যসূত্র:

- বসু, সজল (জানুয়ারি, 2023) "বাংলার রাজনীতির পদাবলী দাঙ্গা-দেশভাগ থেকে দলতন্ত্র-দুর্বৃত্তায়ন 1947-2022"
- বসু, শঙ্কর (11 জুন, 2016), "আনন্দমার্গী হত্যা:বসু সরকার গঠিত কমিশনে একটিও শুনানি হয়নি" সংবাদ প্রতিদিন
- ভট্টাচার্য, তুষার "বিজন সেতু হত্যাকাণ্ড 1982" দৈনিক স্টেটসম্যান, রবিবার 19 এপ্রিল, 2009
- মিত্র, সুনন্দ (30 শে এপ্রিল 2021) বামফ্রন্ট সরকারের সন্ত্রাস ও আনন্দমার্গী হত্যার করুন ইতিহাস।
- Crovetto, Helen (2011), "Ananda Marga, Prout, and the Use of Force", in Lewis, James R. (ed.), Violence and New Religious Movements, Oxford University Press, pp. 249–274, ISBN 9780199735631
- Inayatullah, Sohail (2002). Understanding Sarkar: The Indian Episteme Macrohistory and Transformative Knowledge. Brill. ISBN 9004121935.
- Sil, Narasingha (1988), "The Troubled World of the Ananda Marga: An Examination", The Quarterly Review of Historical Studies, 27 (4)
- "Controversial Movement Survives Years of Conflict, Emerges Stronger Than Ever". Hinduism Today. May 1989. Retrieved 17 February 2013.

মক্কা-প্যাক্ট

আবেগ না নয়া বাস্তব?

ডঃ অনিকেত মহাপাত্র

সৌদি আরব ও ইরানের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, তুরস্কের স্বতন্ত্র আঞ্চলিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা, উপসাগরীয় রাষ্ট্রগুলির নিরাপত্তা-উদ্বেগ, পাকিস্তানের সামরিক ও কূটনৈতিক অবস্থান এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের পশ্চিমি শক্তিগুলির সঙ্গে সম্পর্ক—সব মিলিয়ে মুসলিম বিশ্ব কোনও একক রাজনৈতিক সত্তা নয়। এখানে সুন্নি ও শিয়া বিভাজন যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় স্বার্থ, রাজতান্ত্রিক ও প্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার পার্থক্য এবং অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা।

হুথি বিদ্রোহীদের ড্রোন মুহুর্মুহু উড়ে আসছে মক্কার দিকে; আঘাত করছে মদিনার বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতেও। স্ক্রিনে চোখ রাখা সবজান্তা গোবু ডাক্তার চমকে চমকে উঠছেন। চেম্বারে বসে থাকা রুগিরাও ভিরমি খাবার জোগাড়। ডাক্তার চমকে ওঠেন কিনা! তিনি সেই ডাক্তার, যাদের সঙ্গে মত মেলে তাদের সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করেন। বাইরে বসে থাকে রুগিরা। খেয়াল নেই গোবুর। নিতান্ত কালিকার চপ, বসন্ত কেবিনের কবিরাজির জন্য ডাক্তারিটা করতে হয়! নচেৎ.... তাঁর চোখের সামনে ভাসেন মাও, চে প্রমুখ। স্বপ্নে আসেন লেনিন, স্তালিন কখনও বা মার্কস কিংবা এঙ্গেলস। ইদানিং এঁদের বাজারটা অবশ্য ভালো নেই। যাদবপুরের আগুনখোরেরা কেমন যেন মিইয়ে গেছেন। গাজা নিয়ে শোক- উত্তাপ হঠাৎ যেন কমে গেছে। শান্তিকামী ও পশ্চিমমুখী কমরেডরা আজকাল বড়ো কম আসছেন। চিন্তিত ও বিভ্রান্ত গোবু ডাক্তার। এঁকে ডাক্তার বলা হলেও হতে পারেন উকিল, হতে পারেন অধ্যাপক! ড.ঝাঁজশেখর বাসু তাঁর 'কম: পুরাণ' গ্রন্থে গোবুর উৎস সম্পর্কে জানিয়েছেন যে, 'গবেট' জাত হন এঁরা। বয়স বাড়লেও যাঁদের বোধের বিকাশ হয় না। এবং এঁরাই গো বোধের সহায়ক হন। কখনও বা ভক্ষক। আরও গভীর অর্থে যাঁরা অতিশয় সুচতুর এবং চাতুর্যের অঙ্গ হিসেবে গবেট হবার ভান করে নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করেন। সে যাই হোক গোবুদের এখন দিনকাল ভালো নয় কারণ মক্কা প্যাক্ট অক্কা পেয়েছে। তবে এই কথকতার শেষে গোবুর জন্য অবশ্য আনন্দের সংবাদও আছে। আর সেই আনন্দে আত্মহারা হয়ে গোবুর এক প্রাণের বন্ধু কমরেড সারারাত জুড়ে পৃথিবীকে জলশূন্য করে, সেই পাত্তরগুলো 'বাতায়ন যোগে' গোবুকে উপহার দিয়ে গেছে। অবশ্য নিন্দুকেরা বলে লক্ষ্য ছিল ভিন্ন একজন। এবার যে কারণে গোবুরা বিভ্রান্ত সেই বিষয়ে আসা যাক।

> **এই মক্কা প্যাক্ট সংকীর্ণ কিছু লক্ষ্যকে সামনে রেখেছে। এই জোট কার্যত গ্লোবাল জিহাদকে প্রমোট করার দিকে এগিয়ে যাবে। এই জোটের কেউ পূর্বে কিংবা বর্তমানেও গোঁড়া ওয়াহাবি ও সালাফি ধারণার পৃষ্ঠপোষক। কেউ আবার আই এস আই এস – এর ধাত্রীভূমি। পূর্বে মধ্যযুগীয় বর্বরতার পক্ষে লড়াইয়ের জন্য বিশ্ব জুড়ে যেসব মগজ ধোলাই হওয়া লোকেরা আসত তারা বেছে নিত দেশটিকে ট্রানজিট হিসেবে।**

বিশ্বরাজনীতির ইতিহাসে এমন কিছু

সন্ধিক্ষণ আসে, যখন একটি চুক্তি, একটি কূটনৈতিক উদ্যোগ কিংবা কয়েকটি রাষ্ট্রের পারস্পরিক সমঝোতা প্রচলিত রাজনৈতিক সমীকরণকে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করে। একবিংশ শতাব্দীর আন্তর্জাতিক রাজনীতিও তেমন এক সন্ধিক্ষণের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। পশ্চিম এশিয়ার সংঘাত, মুসলিম বিশ্বের অভ্যন্তরীণ ঐক্যের আকাঙ্ক্ষা, মার্কিন নেতৃত্বাধীন নিরাপত্তাব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা, চিনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব এবং রাশিয়ার ভূরাজনৈতিক প্রত্যাবর্তন—সব মিলিয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পরিচিত কাঠামো দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে 'মক্কা প্যাক্ট' কিংবা 'মুসলিম ন্যাটো'কে দেখা দরকার। এই ধরনের ধারণার উত্থান একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সংহতির প্রশ্ন অবশ্যই; এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ক্ষমতার পুনর্বণ্টন, নিরাপত্তার নতুন সংজ্ঞা এবং তথাকথিত উদারনৈতিক বিশ্বব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতার সংকট। ধ্রুপদী কথা হিসেবে এটি ঠিক আছে। গোবুরাও এই কথা বিশ্বাস করেন। কিন্তু এ হল সুন্নি সমঝোতা। শিয়াদের কোনও প্রতিনিধিত্ব নেই। আর সুন্নি বিশ্বের দুই প্রতিযোগী দেশ এতে রয়েছে। যা দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্কের অন্তরায়। অটোমান তুর্কির দখলে দীর্ঘকাল ছিল মক্কা। পুরোনো স্মৃতি ভূতের মতো পেছনে তাড়া করবে না তার নিশ্চয়তা কই! এই সমঝোতায় রয়েছে আর একটি দেশ যার দরকার শুধুই অর্থ। কারণ দেশ দেউলিয়া। এক অদ্ভুত প্যাক্ট! তুর্কি বাহিনী সৌদিকে বাঁচাতে এলে আর ফিরতে নাও চাইতে পারে। পরোক্ষভাবে দখল নিতে পারে মক্কা মদিনার। তবেই তো উচ্চাকাঙ্ক্ষী এরদোগানের খলিফা হওয়া হবে। আর পাকিস্তান তাকিয়ে আছে সৌদির তৈল খনির দিকে। ফলে এমন প্যাক্ট হয়েছে, যা দীর্ঘমেয়াদি কোনও নিশ্চয়তার বার্তা বহন করে না।

ইসলামি বিশ্বের ঐক্যের ধারণা নতুন নয়। উসমানীয় খেলাফতের অবসানের পর থেকে বিভিন্ন সময়ে মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক সংহতি, অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং সম্মিলিত নিরাপত্তার প্রশ্ন সামনে এসেছে। ১৯৬৯ সালে প্রতিষ্ঠিত ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা বা অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কো-অপারেশন (OIC) এই আকাঙ্ক্ষার একটি প্রাতিষ্ঠানিক প্রকাশ। মুসলিম-প্রধান রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা, পবিত্র স্থানগুলির সুরক্ষা, ফিলিস্তিনের প্রশ্ন এবং আন্তর্জাতিক মঞ্চে সম্মিলিত অবস্থান গ্রহণ— এসবই সংস্থাটির কার্যক্রমের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কিন্তু দীর্ঘ অভিজ্ঞতা দেখিয়েছে, ধর্মীয় পরিচয়ের অভিন্নতা রাজনৈতিক স্বার্থের অভিন্নতা নিশ্চিত করে না। সৌদি আরব ও ইরানের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, তুরস্কের স্বতন্ত্র আঞ্চলিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা, উপসাগরীয় রাষ্ট্রগুলির নিরাপত্তা-উদ্বেগ, পাকিস্তানের সামরিক ও কূটনৈতিক অবস্থান এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের পশ্চিমি শক্তিগুলির সঙ্গে সম্পর্ক—সব মিলিয়ে মুসলিম বিশ্ব কোনও একক রাজনৈতিক সত্তা নয়। এখানে সুন্নি ও শিয়া বিভাজন যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় স্বার্থ, রাজতান্ত্রিক ও প্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার পার্থক্য এবং অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা।

অতএব, একটি বৃহত্তর মুসলিম ঐক্যের ধারণা রাজনৈতিকভাবে আকর্ষণীয় হলেও তাকে কার্যকর নিরাপত্তাব্যবস্থায় রূপান্তরিত করা সহজ নয়। তার জন্য প্রয়োজন পারস্পরিক আস্থা, নির্দিষ্ট প্রতিরক্ষা-নীতি, গোয়েন্দা তথ্যের আদানপ্রদান, যৌথ সামরিক মহড়া, অর্থায়নের ব্যবস্থা এবং সংকটকালে সম্মিলিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুস্পষ্ট কাঠামো।ধর্মীয় আবেগ রাজনৈতিক সমর্থন তৈরি করতে পারে; কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী সামরিক জোট প্রতিষ্ঠার জন্য আবেগের পাশাপাশি প্রয়োজন বাস্তব স্বার্থের সমন্বয়।

ন্যাটো বা নর্থ আটলান্টিক ট্রিটি অর্গানাইজেশনের মূল শক্তি কেবল সদস্যরাষ্ট্রগুলির সামরিক ক্ষমতায় নিহিত নয়। এর শক্তির উৎস একটি নির্দিষ্ট চুক্তিগত কাঠামো, দীর্ঘদিনের সামরিক সমন্বয়, যৌথ পরিকল্পনা এবং সম্মিলিত প্রতিরক্ষার প্রতিশ্রুতি। ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত ন্যাটোর পঞ্চম অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, কোনও সদস্যের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আক্রমণকে সকল সদস্যের বিরুদ্ধে আক্রমণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়; যদিও প্রতিটি সদস্য কী ধরনের সহায়তা দেবে, সে বিষয়ে তার নিজস্ব সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার ভূমিকা রয়েছে। মুসলিম-প্রধান রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অনুরূপ কোনও ব্যবস্থা গড়ে উঠলে তা আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ করতে পারে। সৌদি আরবের আর্থিক শক্তি, তুরস্কের সামরিক সক্ষমতা ও প্রতিরক্ষা-শিল্প, পাকিস্তানের পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্র হিসেবে অবস্থান এবং ইন্দোনেশিয়া, মিশরসহ অন্যান্য রাষ্ট্রের জনসংখ্যাগত ও কৌশলগত গুরুত্ব— এই সম্ভাব্য সমীকরণকে তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলতে পারে। তবে এই শক্তিগুলিকে একই রাজনৈতিক লক্ষ্যে পরিচালিত করা বড় চ্যালেঞ্জ। কোনও রাষ্ট্রের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা সহযোগিতা রয়েছে, কোনও রাষ্ট্র রাশিয়ার সঙ্গে সামরিক সম্পর্ক বজায় রাখে, আবার কেউ চিনের সঙ্গে অর্থনৈতিক ও কৌশলগত অংশীদারত্বকে অগ্রাধিকার দেয়। একই সঙ্গে রাষ্ট্রগুলির নিরাপত্তা-উদ্বেগও এক নয়। সৌদি আরবের কাছে উপসাগরীয় নিরাপত্তা এবং জ্বালানি অবকাঠামোর সুরক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; তুরস্কের কাছে তার আঞ্চলিক অবস্থান ও সীমান্ত-নিরাপত্তা; পাকিস্তানের কাছে দক্ষিণ এশিয়ার কৌশলগত ভারসাম্য; আর ইন্দোনেশিয়ার কাছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার স্থিতিশীলতা বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। এমন পরিস্থিতিতে একটি ধর্মীয় পরিচয়কে ভিত্তি করে সামরিক জোট গড়ার চেষ্টা বাস্তব কূটনীতির পরীক্ষার মুখে পড়বে। কারণ, কোনও সম্ভাব্য জোটের সদস্যরাষ্ট্রগুলি যদি নিজেদের পারস্পরিক বিরোধ মেটাতে না পারে, তবে বাইরের কোনও শক্তির বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিরোধের প্রতিশ্রুতি কতটা কার্যকর হবে, সেই প্রশ্ন থেকেই যায়।

জাতিসংঘ কিংবা রাষ্ট্রসংঘের গঠন হয় যে উদ্দেশ্য নিয়ে তা বারবার ব্যর্থ হয়েছে এবং হয়। তখনই প্রয়োজন হয়ে পড়ে জোট বাঁধার। কিছু সাধারণ লক্ষ্য ও স্বার্থ থাকে সামনে। এই মক্কা প্যাক্ট সংকীর্ণ কিছু লক্ষ্যকে সামনে রেখেছে। এই জোট কার্যত গ্লোবাল জিহাদকে প্রমোট করার দিকে এগিয়ে যাবে। এই জোটের কেউ পূর্বে কিংবা বর্তমানেও গোঁড়া ওয়াহাবি ও সালাফি ধারণার পৃষ্ঠপোষক। কেউ আবার আই এস আই এস – এর ধাত্রীভূমি। পূর্বে মধ্যযুগীয় বর্বরতার পক্ষে লড়াইয়ের জন্য বিশ্ব জুড়ে যেসব মগজ ধোলাই হওয়া লোকেরা আসত তারা বেছে নিত দেশটিকে ট্রানজিট হিসেবে। চুক্তির মধ্যে থাকা আর একটি দেশটির তো জেহাদি নেটওয়ার্কের ব্যবসা রয়েছে। এই মিত্রতা অলিখিতভাবে পূর্বে ছিলই। কিন্তু এই ঘোষিত অবস্থান পশ্চিম এশিয়ায় নতুন সংকটের সৃষ্টি করতে পারে। একে শয়তানি ত্রিভুজ বললেও অত্যুক্তি হয় না।

তবে এখানে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। প্রতিটি সংঘাতের ইতিহাস, পক্ষগুলির দায় এবং আন্তর্জাতিক আইনের প্রশ্ন আলাদা। সব ঘটনাকে একই মাপকাঠিতে বিচার না করে নির্দিষ্ট তথ্য ও প্রমাণের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করতে হবে। কিন্তু একটি মৌলিক প্রশ্ন থেকেই যায়— যদি আন্তর্জাতিক আইন শক্তিধর রাষ্ট্রের স্বার্থের কাছে বারবার দুর্বল হয়ে পড়ে, তাহলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি রাষ্ট্রগুলি নিজেদের নিরাপত্তা কোথায় খুঁজবে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়েই অনেক রাষ্ট্র বিকল্প জোট, আঞ্চলিক সহযোগিতা এবং পরিচয়ভিত্তিক কূটনীতির দিকে ঝুঁকছে। ধর্মীয় সংহতির নতুন আহ্বানকে সেই বৃহত্তর প্রবণতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না। মুসলমানদের উম্মাহ গড়ার ধারণা আগাগোড়া ছিল। তাই এই প্রবণতা তাদের জন্য নতুন নয়। কিন্তু এই ঘটনা এইকথা প্রমাণ করে হিন্দু-বৌদ্ধ দেশগুলির এক জায়গায় আসা প্রয়োজন। শ্রীলঙ্কায় ও থাইল্যান্ডে যেভাবে জেহাদি প্রভাব বাড়ছে দ্রুতগতিতে, তাতে এই দুই থেরবাদী বৌদ্ধ পন্থার দেশ সংকটের মুখে। এই দুটি দেশে কিছু পেট্রো ডলারের আড়কাঠি আছে। যারা চীবর পরে জেহাদি ন্যারেটিভকে পরোক্ষভাবে শক্তিশালী করার জন্য। বাংলাদেশে থাকা এবং বাংলাদেশ থেকে আসা এমন কিছু আড়কাঠি আছে, তাদের কেউ কেউ বুদ্ধ গয়ায় বসে অবধি বখতিয়ার ভজনা করছে। তাদের সমাজের কিছু তথাকথিত আলোকিত অংশ তাদের সঙ্গত করছে। এটি একটি আত্মঘাতী প্রবণতা। যার খেসারত দিচ্ছে কোনও কোনও দেশ। বরং এটিই সময় হাতে হাত রেখে চলার।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একক প্রভাবের পাশাপাশি চিনের উত্থান, রাশিয়ার কৌশলগত ভূমিকা, ইউরোপের নিরাপত্তা-উদ্বেগ এবং আঞ্চলিক শক্তিগুলির ক্রমবর্ধমান সক্রিয়তা আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাকে বহুমেরুকেন্দ্রিক করে তুলছে। এই পরিস্থিতিতে মুসলিম-প্রধান রাষ্ট্রগুলির সম্মিলিত কূটনৈতিক বা সামরিক উদ্যোগের সম্ভাবনাকে বৃহত্তর ক্ষমতার পুনর্বিন্যাসের অংশ হিসেবে দেখতে হবে বলে একটি জনপ্রিয় মত রয়েছে পশ্চিমা বিশ্বে।কিন্তু বহুমেরুকেন্দ্রিক বিশ্ব মানেই শান্তিপূর্ণ বিশ্ব নয়। একাধিক শক্তিকেন্দ্রের উপস্থিতি যেমন কোনও একক শক্তির আধিপত্য সীমিত করতে পারে, তেমনই তা প্রতিদ্বন্দ্বিতা, অস্ত্র প্রতিযোগিতা এবং আঞ্চলিক সংঘাতের ঝুঁকিও বাড়াতে পারে।

পরিচয়ভিত্তিক রাজনীতির প্রত্যাবর্তন নিয়ে একটি ভাষ্য উঠে আসে। তার কিছু অংশ ভারতের জন্য একেবারেই প্রযোজ্য নয়। কারণ ভারতের প্রাণবস্তু হল সনাতন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। যা ভারত ধর্ম (বৌদ্ধ, জৈন, শিখ এবং বৃহত্তর দিক থেকে পারসিক)- এর সার বস্তুকে নিজের গর্ভে বহন করে। দেখে নেওয়া যেতে পারে ভাষ্যটি।

শীতল যুদ্ধের অবসানের পর অনেকেই মনে করেছিলেন, ভবিষ্যতের আন্তর্জাতিক রাজনীতি ক্রমশ অর্থনীতি, প্রযুক্তি ও উদারনৈতিক প্রতিষ্ঠানের দ্বারা পরিচালিত হবে। ধর্মীয় পরিচয় এবং সভ্যতাগত পার্থক্য ক্রমশ গৌণ হয়ে পড়বে। কিন্তু একবিংশ শতাব্দীর অভিজ্ঞতা সেই ধারণাকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে।বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে জাতীয়তাবাদ, ধর্মীয় পরিচয়, সভ্যতাগত আত্মপরিচয় এবং ঐতিহাসিক স্মৃতির রাজনৈতিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। রাষ্ট্রগুলি এখন কেবল বাণিজ্যিক লাভ কিংবা সামরিক শক্তির হিসাব করছে না; তারা নিজেদের সভ্যতাগত অবস্থান, ঐতিহাসিক মর্যাদা এবং সাংস্কৃতিক নিরাপত্তার প্রশ্নও সামনে আনছে।

এর অন্যতম কারণ হল ইসলাম। কখনও কখনও খ্রিষ্টান। তারা যেভাবে গণহারে ধর্মান্তকরণ করিয়েছে ও করাচ্ছে, তাতে মানুষ আরও ধর্ম সচেতন হয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। যদি ধর্ম বলে কিছু না থাকে, সব ধর্ম সমান হয়, তাহলে ধর্মান্তরের প্রয়োজন কী! এই ধর্মকে 'এড্রেস' কমিউনিজম ব্যর্থ, লিবারেলরাও ব্যর্থ। ফলে সভ্যতার সঙ্গে সভ্যতার সংঘর্ষ অনিবার্য। খ্রিষ্টান ও মুসলিমরা ঐক্যবদ্ধ। প্রয়োজন হিন্দু ও বৌদ্ধদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার।

রাজনীতি বিচ্যুত কিছুই নয়! ধর্মেরও একটি রাজনৈতিক অনুষঙ্গ আছে। কোনও ধর্মীয় পরিচয়ভিত্তিক জোট যদি নিজেকে কেবল একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের প্রতিরক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে, তবে তার কূটনৈতিক পরিসর সংকুচিত হতে পারে। কিন্তু যদি সেই সংহতির ভিত্তি হয় সার্বভৌমত্বের প্রতি সম্মান, আন্তর্জাতিক আইনের সমান প্রয়োগ, মানবিক মর্যাদা এবং সকল রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, তবে তা বৃহত্তর আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার গঠনমূলক অংশীদারও হতে পারে।সুতরাং প্রশ্নটি মুসলিম রাষ্ট্রগুলি ঐক্যবদ্ধ হবে কি না, শুধু তা নয়। প্রশ্ন হল, সেই ঐক্যের রাজনৈতিক দর্শন কী হবে। এখানে সম্ভবত ব্যর্থ হবে এই জোট। কারণ এদের কোনও সহনশীলতার ইতিহাস নেই। তাই নিজের সম্প্রদায় ছাড়া আর কেউ নিরাপদ নয় এদের কাছে।

ভারতের জন্য সম্ভাব্য কোনও বৃহত্তর মুসলিম নিরাপত্তা-সমীকরণ গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে, কিন্তু তার প্রভাব নির্ভর করবে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলির প্রকৃত নীতি ও কার্যকলাপের ওপর। ভারতের সঙ্গে সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, ইরান, তুরস্ক, ইন্দোনেশিয়া এবং অন্যান্য মুসলিম-প্রধান রাষ্ট্রের সম্পর্কের প্রকৃতি এক নয়। জ্বালানি নিরাপত্তা, বাণিজ্য, বিনিয়োগ, প্রবাসী ভারতীয়দের স্বার্থ, সামুদ্রিক যোগাযোগ, সন্ত্রাসবাদবিরোধী সহযোগিতা এবং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা—প্রতিটি ক্ষেত্রেই পৃথক কূটনৈতিক হিসাব রয়েছে।ভারতের কৌশলগত স্বার্থ রক্ষার জন্য অন্তত চারটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথমত, ভারতকে পশ্চিম এশিয়ার সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রের সঙ্গে কার্যকর কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। কোনও একটি শক্তিকেন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নত করার জন্য অন্য গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রের সঙ্গে অপ্রয়োজনীয় বিরোধে জড়িয়ে পড়া উচিত নয়।

দ্বিতীয়ত, প্রতিরক্ষা ও গোয়েন্দা সহযোগিতার ক্ষেত্রে বাস্তব পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করতে হবে। কোনও সম্ভাব্য জোটের ঘোষণার চেয়ে তার সদস্যপদ, সামরিক সক্ষমতা, চুক্তির শর্ত, যৌথ মহড়া এবং কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

তৃতীয়ত, ভারতকে ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে নিজের সামুদ্রিক নিরাপত্তা ও যোগাযোগব্যবস্থা শক্তিশালী করতে হবে। জ্বালানি পরিবহণ, বাণিজ্যপথ, বন্দর এবং সমুদ্রপথের নিরাপত্তা ভারতের অর্থনৈতিক ভবিষ্যতের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত।

চতুর্থত, ভারতের পররাষ্ট্রনীতি কোনও আবেগের প্রতিক্রিয়ায় পরিচালিত না হয়। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, জাতীয় স্বার্থ, আন্তর্জাতিক আইন এবং দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত স্থিতিশীলতাই হওয়া উচিত সিদ্ধান্তের প্রধান ভিত্তি।

একই সঙ্গে ভারতকে এমন আন্তর্জাতিক অংশীদারত্ব গড়ে তুলতে হবে, যেখানে ধর্মীয় পরিচয় নির্বিশেষে রাষ্ট্রগুলির সার্বভৌমত্ব ও পারস্পরিক নিরাপত্তা সম্মানিত হয়। ভারতের বহুমুখী কূটনীতি কোনও দুর্বলতা নয়; বরং পরিবর্তনশীল বিশ্বে তার একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ।

বিশ্ব এখন এমন একটি পর্যায়ে প্রবেশ করেছে, যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একক প্রভাবের পাশাপাশি চিনের উত্থান, রাশিয়ার কৌশলগত ভূমিকা, ইউরোপের নিরাপত্তা-উদ্বেগ এবং আঞ্চলিক শক্তিগুলির ক্রমবর্ধমান সক্রিয়তা আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাকে বহুমেরুকেন্দ্রিক করে তুলছে। এই পরিস্থিতিতে মুসলিম-প্রধান রাষ্ট্রগুলির সম্মিলিত কূটনৈতিক বা সামরিক উদ্যোগের সম্ভাবনাকে বৃহত্তর ক্ষমতার পুনর্বিন্যাসের অংশ হিসেবে দেখতে হবে বলে একটি জনপ্রিয় মত রয়েছে পশ্চিমা বিশ্বে ।কিন্তু বহুমেরুকেন্দ্রিক বিশ্ব মানেই শান্তিপূর্ণ বিশ্ব নয়। একাধিক শক্তিকেন্দ্রের উপস্থিতি যেমন কোনও একক শক্তির আধিপত্য সীমিত করতে পারে, তেমনই তা প্রতিদ্বন্দ্বিতা, অস্ত্র প্রতিযোগিতা এবং আঞ্চলিক সংঘাতের ঝুঁকিও বাড়াতে পারে। রাষ্ট্রগুলি যদি নিজেদের নিরাপত্তাকে অন্যের অনিরাপত্তার সঙ্গে যুক্ত করে দেখে, তবে নিরাপত্তার নামে গৃহীত পদক্ষেপ শেষ পর্যন্ত অনিরাপত্তাকেই বাড়িয়ে তুলতে পারে।সুতরাং ভবিষ্যতের প্রশ্নটি কোনও একটি ধর্মীয় জোটের আবির্ভাবেই সীমাবদ্ধ নয়। প্রশ্ন হল, আন্তর্জাতিক রাজনীতি কি এমন এক কাঠামোর দিকে এগোবে, যেখানে বিভিন্ন সভ্যতা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেও সহযোগিতা করবে, নাকি ধর্মীয় ও জাতীয় পরিচয়কে স্থায়ী সংঘাতের ভিত্তিতে পরিণত করবে?

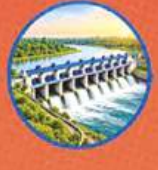
এই প্রশ্নের উত্তর আপনি পাবেন না। মুসলিম বিশ্বের কাছে। খ্রিষ্টান বিশ্বের কাছে। ভাসা ভাসা কোনও উত্তর ভেসে আসতে পারে অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ - এর তথাকথিত বুধমণ্ডলীর কাছ থেকে। বা নিউইয়র্ক টাইমস – এর সবজান্তা সাংবাদিকের কাছ থেকে। যাঁদের উত্তরটা হবে প্রশ্নের চেয়ে কয়েকশো গুণ জটিল। উত্তর পাবেন ভারতের কাছে, বৃহত্তর ভারতের কাছে। ভারত ধর্মের কাছে। যারা কয়েক হাজার বছর ধরে এর উত্তরই প্রস্তুত করে গেছে সভ্যতার যাপনের মধ্য দিয়ে।

সর্বশেষ সংবাদ অনুযায়ী প্রায় আট হাজার পাকিস্তানি সেনা নতুন করে সৌদি আরবে পৌঁছেছে। বিমানবাহিনীর একাধিক স্কোয়াড্রন ওই দেশে মোতায়েন হয়েছে। কিন্তু সবই বেসরকারি সূত্রে। গোবু ডাক্তার আজ খুব আনন্দে আছেন। কিন্তু চেপে রেখেছেন দাঁত। কিছুটা বিভ্রান্ত তিনি। তাঁর মতো অনেকেই এইরকম কিংকর্তব্যবিমূঢ়! পেট্রোপিতার দারোয়ান দেশ বোমা বর্ষণ করছে ইয়েমেনে। আনন্দ হচ্ছে! কিন্তু মাঝে মাঝে হারিয়ে ফেলছেন খেই। ইরান ফ্যাক্টর আছে কিনা! হুথি মিসাইল, ড্রোন পৌঁছতে পারে করাচিও। তাহলে কী হবে 'অমন কি আশা'- র। এই চিন্তায়, ভাবনায় বিভ্রান্তিতে গোবু ডাক্তার আর বাড়ি ফেরেন নি। রয়ে গেছেন চেম্বারে। গিলছেন পাত্তর পাত্তর। তাঁর চ্যালা এইরকম করে বসবে কে জানত ! সবই বিভ্রান্তি!

৬ মাসে
৬টি বড় পদক্ষেপ



সুন্দরবন উন্নয়নে ১,২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ



ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের জন্য ১,২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ



উন্নত বিদ্যালয় পরিকাঠামোর জন্য ২৯৬.৬৪ কোটি টাকা অনুমোদন



৫০,০০০ জন স্কুলশিক্ষক নিয়োগের উদ্যোগ



সিভিক ভলান্টিয়ার, হোমগার্ড ও গ্রিন পুলিশদের মাসিক ভাতা ২,০০০ টাকা বৃদ্ধি



মহার্ঘ ভাতা(DA) ১৮% থেকে বাড়িয়ে ৩৮ % করা হয়েছে



/BJP4Bengal bjpbengal.org



ভারতীয় জনতা পার্টি পশ্চিমবঙ্গ শাখার পক্ষে জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত এবং অঙ্কিত প্রিন্টিং হাউস, কলকাতা - ৭০০ ০০৯ হইতে মুদ্রিত।